জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র

সংখ্যা ২৬॥ সেপ্টেম্বর ২০০১ ইংরেজী॥ ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধ সংখ্যা॥

সম্পাদকীয়

১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর এবারই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র 'জুম্ম সংবাদ বুলেটিন' প্রকাশ হতে যাচ্ছে। অনিবার্য কারণবশতঃ দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রকাশ করতে না পারায় তথ্য ও প্রচার বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এবার থেকে এ মুখপত্র নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভবপর হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে সংবিধানের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং বিশেষ শাসন কাঠামো প্রবর্তনের বিধি-ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক যে, চুক্তি মোতাবেক স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগামী ১ অক্টোবর ২০০১ সারা দেশের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামেও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধের ডাক দিতে বাধ্য হয়েছে।

বলা বাহুল্য, গত বছর মে-জুন মাসে প্রণীত ভোটার তালিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং বাংলাদেশের সংবিধান ও ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২-কে লঙ্ঘন করে স্বৈরাচারী আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে নিয়ে আসা সেটেলারসহ হাজার হাজার বহিরাগত লোককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই সঙ্গত কারণেই জুম্ম জনগণসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীরা এই ভোটার তালিকা দিয়ে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন মেনে নিতে পারে না। এই অবৈধ ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং বিশেষ শাসনব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার চুক্তির মৌলিক স্পিরিট ও বিশেষ শাসনব্যবস্থার আওতায় স্বীকৃতি পার্বত্যবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হয়ে যাবে, সর্বোপরি জুম্ম জনগণের জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য।

তাই আসুন, আমরা আসন্ন ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঐক্যবদ্ধ ও সর্বাত্মকভাবে বর্জন ও প্রতিরোধ করি। নির্বাচনে ভোট দান, পোলিং এজেন্ট নিয়োগ, নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকি। সর্বোপরি নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধের আন্দোলন ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তার সাথে অব্যাহতভাবে চালিয়ে নিই যতক্ষণ না পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়।

এ সংখ্যায় আছে

মঙ্গল কুমার চাকমার

কেন জনসংহতি সমিতির নির্বাচন বিরোধিতা?

তাতিন্দ্র লাল চাকমার

জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার

মন্তব্য প্রতিবেদন

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও চুক্তি বিরোধীদের ভূমিকা

খাগড়াছড়িতে নির্বাচন রঙ্গ

তনয় দেওয়ানের

সংসদ নির্বাচন কোন পথে?

জীবন চাকমার

জুম্ম জনগণের সংগ্রাম, সংঘাত, সমঝোতা এবং জেএসএস বিরোধিতা

তিন বিদেশী অপহরণ নাটকের অন্তরালে-

পাকুজ্যাছড়িতে গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও পাহাড়ীদের প্রতিক্রিয়া

রামগড়ে জুম্ম বসতির উপর হামলা ও অগ্নিসংযোগ

দীঘিনালায় জুম্মদের উপর বহিরাগত সেটেলারদের হামলা

এছাড়া রয়েছে

জুম্ম জনগণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতা নিয়ে লেখা

সংবাদ প্রবাহ

কেন জনসংহতি সমিতির নির্বাচন বিরোধিতা?

মঙ্গল কুমার চাকমা

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগামী ১ অক্টোবর ২০০১ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন। নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নানা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও নির্বাচনের জন্য এখন তারা উঠে পড়ে লেগেছে। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার বিশ্ব স্বীকৃত অন্যতম একটি পদ্ধতি হল নির্বাচন। ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর সমিতি যখন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে পদার্পন করে থাকে। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মতো জুম্ম জনগণের এই লড়াকু রাজনৈতিক দলেরও এই নির্বাচনের অংশগ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজ বইছে উল্টো সুর। নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিবর্তে জনসংহতি সমিতি নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কেন এই নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধ?

জনসংহতি সমিতির নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধের মূল কারণ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা। বাংলাদেশের সংবিধান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়নের কথা ছিল কেবলমাত্র তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে প্রণীত হবে। কিন্তু গত ২০০০ সালের মে-জুন মাসে সারা দেশের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রণীত ভোটার তালিকায় স্বৈরাচারী শাসনামলে দেশের অন্যান্য সমতল অঞ্চল থেকে সরকারী উদ্যোগে নিয়ে আসা সেটেলারসহ হাজার হাজার বহিরাগত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জনসংহতি সমিতির বক্তব্য হচ্ছে - পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী ও অস্থায়ী লোকদের নিয়ে প্রণীত ভোটার তালিকা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে, সর্বোপরি বাংলাদেশের সংবিধান ও ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর সাথে সম্পূর্ণভাবে বিরোধাত্মক ও অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই এই ভোটার তালিকা দিয়ে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন জনসংহতি সমিতি তথা পার্বত্যবাসী মেনে নিতে পারে না।

স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে মূল কারণ খুঁজতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিতে হবে। বর্তমান বাংলাদেশের শাসনামল থেকে শুরু করে ইতিহাসের উল্টো দিকে পদযাত্রা করলে পাকিস্তান, ব্রিটিশ শাসনামলসহ প্রাক-ঔপনিবেশিক শাসনামলে আমরা দেখতে পাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বরাবরই বাংলাদেশসহ গোটা ভারতবর্ষ থেকে একটি পৃথক শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা ভোগ করে আসছে। প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ সামন্ত রাজার অধীনে স্বাধীন সত্ত্বার অধিকারী ছিল।

সমগ্র ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে যায় তখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত জুম্ম জনগণের সেই স্বাধীন সত্ত্বার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে ব্রিটিশ রাজের কোন প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া। এমনকি ১৮৬০ সালে যখন চট্টগ্রাম জেলা থেকে পৃথক করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে জেলায় উন্নীত করা হলো তখন তিনজন রাজার অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি প্রশাসনিক সার্কেল প্রবর্তনের মাধ্যমে কার্যতঃ জুম্ম জনগণের স্বকীয় শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রাখা হয়। জুম্ম জনগণের সেই স্ব-শাসন ব্যবস্থার স্বীকৃতি মেলে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতেও যেখানে বহিরাগত কোন লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ছিল কড়াকড়ি বিধি-নিষেধ। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই স্ব-শাসন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন থাকে। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমি থাকে নিরাপদ।

তথাকথিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহকে নিয়ে ১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের। এ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি অমুসলিম (৯৭.৫% অমুসলিম জুম্ম) অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর তখন থেকেই শুরু হয় অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার গভীর ষড়যন্ত্র।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর পরই তাৎক্ষণিকভাবে ১৯৪৮ সালে ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন বাতিলের মাধ্যমে জুম্মদের পুলিশ বাহিনী গঠনের অধিকার খর্ব করা হয়। আর রাষ্ট্রীয়ভাবে শুরু হয় বহিরাগত বসতি স্থাপন। পঞ্চাশ দশকের শুরুতেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমতল উপত্যকা অঞ্চলে ভারত থেকে চলে আসা শত শত শরণার্থী মুসলমান পরিবারকে বসতি প্রদান করা হয় ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করে এবং জুম্ম জনগণের মতামতকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে। তারপরের ইতিহাস কালো অধ্যায়ের ইতিহাস। জুম্ম জনগণের প্রবল আপত্তিকে ধুলোয় উড়িয়ে দিয়ে জুম্ম জনগণের বুকের উপর ১৯৬০ সালে নির্মাণ করা হয় কাপ্তাই বাঁধ। এতে এক লক্ষের মতো জুম্ম নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ধান্য জমির ৪০% জমি পানির নীচে তলিয়ে যায়।

তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী মুখে যতই দেশের শিল্পায়নের নামে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কথা বলুক এটা জাতিসত্তা নিশ্চিহ্নকরণ (Ethnic Cleansing) পরিকল্পনা বৈ অন্য কিছু নয়। সেই ধারা বলবৎ রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশ শাসনামলেও - যে দেশ জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করে ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখের

সাথে বলতে হয়, সেই জাতিসত্তা নিশ্চিহ্নকরণের ধারা আরো তীব্র ও উলঙ্গ রূপ ধারণ করে এই বাংলাদেশের শাসনামলে। দেশের সমতল জেলাগুলো থেকে সরকারী উদ্যোগে নিয়ে আসা হয় লক্ষ লক্ষ বহিরাগত বাঙালী। ফলে সরকারী হিসেব মতে ১৯৯১ সালের আদমশুমারীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার হার দাঁড়ায় জুম্ম ৫১% এবং অ-জুম্ম ৪৯%। জনসংখ্যার এই অনুপাত সরকারী হিসেব থেকে বাস্তবতঃ আরো ভয়াবহ বলে জুম্ম জনগণ মনে করে।

তাই ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সম্পাদনকালে এই বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চুক্তিতে ১৯০০ সালের শাসনবিধির মতো বহিরাগত বসতিস্থাপনের ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ বিধি-নিষেধের বিধান লিপিবদ্ধ করা না হলেও চুক্তিতে এমন বিধান করা হয়েছে যা বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য ও জুম্ম জনগণের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখার মজবুত ভিত্তি তৈরী হয়ে থাকে। চুক্তির প্রারম্ভেই পার্বত্য চট্টগ্রামের এই বৈশিষ্ট্যকে মজবুত ভিত্তি দেয় এই মর্মে যে, "উভয় পক্ষ (সরকার ও জনসংহতি সমিতি) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।"

দ্বিতীয়তঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার ভোটাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে উক্ত চুক্তির 'খ' খন্ডের ৯ নম্বর ধারায় (যা পরবর্তীতে ১৯৯৮ সনের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহের ১১ নম্বর ধারায় সন্নিবেশিত হয়) কেবলমাত্র তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান করা হয়।

তৃতীয়তঃ চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩ নং ধারায় বাংলা ভাষাভাষিদের মধ্যে কারা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হবেন তা স্পষ্ট করা হয় এই মর্মে যে, "অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন, যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।"

চতুর্থতঃ বহিরাগত লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে যাতে জায়গা-জমি ক্রয় করে পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা হিসেবে দাবী করতে বা পরিগণিত হতে না পারেন তজ্জন্যে চুক্তির 'খ' খন্ডের ২৬ নং ধারায় বিধান করা হয় যে, "আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের (জেলা পরিষদ) পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।" এমনকি জেলা পরিষদের সাথে আলোচনা ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য জেলার কোন প্রকার জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণও করা যাবে না বলে বিধান করা হয়।

পঞ্চমতঃ ইতিমধ্যে সরকারী উদ্যোগে বসতিদানকারী সেটেলারদের দ্বারা বেদখলকৃত জমিজমা যাতে জুম্মদের নিকট প্রত্যর্পণ করা যায় তজ্জন্যে চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ৪, ৫ ও ৬ নং ধারায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ল্যান্ড কমিশন গঠনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধি-ব্যবস্থাও করা হয়। উল্লেখ্য যে, জুম্মদের যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় প্রচলিত প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধানও প্রণয়ন করা হয়। এর ফলে চুক্তিতে জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকারও স্বীকৃতি লাভ করে। বলা বাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি, বিশেষতঃ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে সেটেলারদের প্রদত্ত ভূমি বন্দোবস্তি অবৈধ ও বেআইনী। তাই তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

ষষ্ঠতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য ও জুম্ম জনগণের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আনুষ্ঠানিক সংলাপ চলাকালে স্বৈরাচারী আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিদানকারী সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দিয়ে এবং তাদেরকে প্রদেয় রেশন বন্ধ করে দিয়ে এবং সর্বোপরি সম্মানজনক পুনর্বাসনের মাধ্যমে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে বসতিদানেরও অলিখিত ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন যেদিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেদিন যখন জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন।

বস্তুতঃ চুক্তি স্বাক্ষরের পেছনে মূল স্পিরিট ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য ও জুম্ম জনগণের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখা। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি অনগ্রসর জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন বিধায় জুম্ম জনগণের এই বিশেষ অধিকার ও বিশেষ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের (৪) উপ-অনুচ্ছেদ এই মর্মে পারমিট করে যে, "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না" তাই সংবিধানের উল্লেখিত অনুচ্ছেদের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এই অনুচ্ছেদের আওতায় স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিশেষ বিধান প্রণয়ন সঙ্গতিপূর্ণ ও বিধিসম্মত।

অনুরূপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও জুম্ম জনগণের বিশেষ শাসনব্যবস্থার আলোকে জুম্ম জনগণের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার ভোটাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সংবিধানের ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা সংক্রান্ত ১২২ অনুচ্ছেদের সাথে সাজুয্যপূর্ণ। উক্ত অনুচ্ছেদের (২)(ঘ) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "(২) কোন ব্যক্তি সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি ...... (ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন"। ১৯৯৮ সনে প্রণীত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে অ-উপজাতীয়দের (বাঙালীদের) মধ্যে কারা স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হবেন তা নির্ধারিত হয়েছে সেহেতু সংবিধান মোতাবেক শুধুমাত্র স্থায়ী অ-উপজাতীয়দেরই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটার-তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

সংবিধানের মতো অনুরূপ বিধান ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ৭(১)(ডি) এবং ৮ নং ধারাতে রয়েছে - যেখানে কোন নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা অথবা বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হন বা কোন ব্যক্তি 'বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হবেন' যদি তিনি সাধারণতঃ কোন স্থানীয় সংস্থা বা পার্লামেন্ট নির্বাচনী এলাকায় বসবাস করেন তিনিই একমাত্র স্থানীয় সংস্থা বা পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হবেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

সরকার পক্ষ বলে থাকে যে, চুক্তিতে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত যে বিধান রয়েছে তা কেবলমাত্র পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই জেলা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হবে এবং সেই ভোটার তালিকা দিয়ে জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর বাদবাকী সকল নির্বাচন যথা জাতীয় সংসদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম পরিষদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে প্রণীত ভোটার তালিকার মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বস্তুতঃ এটা সংবিধান পরিপন্থী ও ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ পরিপন্থী বক্তব্য। কোন আইনেই অস্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান নেই। বরং সংবিধানের ১২১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে,"সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করিয়া ভোটার তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না"। তাই জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য একটি এবং অন্যান্য নির্বাচনের জন্য অন্য আরেকটি - এভাবে যদি দু'টি ভোটার তালিকা প্রণীত হয় তাহলে তা হবে সংবিধান পরিপন্থী।

তাই বাংলাদেশের সংবিধান, ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এবং সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ভোটার তালিকা জুম্ম জনগণসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দারা, বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী অন্যতম পক্ষ হিসেবে জনসংহতি সমিতি কখনোই মেনে নিতে পারে না এবং এই ভোটার তালিকা দিয়ে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনই গ্রহণ করতে পারে না।

সুতরাং এই ভোটার তালিকা এবং এই ভোটার তালিকার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন মেনে নেয়ার অর্থ চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষ হিসেবে জনসংহতি সমিতি নিজেই চুক্তি লঙ্ঘন করা, চুক্তি বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়তঃ এই ভোটার তালিকা মেনে নেয়ার অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করা, চরমভাবে পদদলিত করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে বিশেষ শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ অধিকার প্রদান করে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীরা যাতে তাদের ভাগ্য তারাই নির্ধারণ করতে পারে চুক্তির সেই মৌলিক স্পিরিট খর্ব হয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ এই ভোটার তালিকা এবং এই ভোটার তালিকা দিয়ে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন মেনে নেয়ার অর্থ চার লক্ষাধিক সেটেলারসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত বহিরাগত হাজার হাজার সেনা, বিডিআর, আনসার, এপিবি ও পুলিশবাহিনীর সদস্য এবং চাকুরী ও অর্থনৈতিক সূত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত বহিরাগত লোকদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে মেনে নেয়া, সেটেলারদের দ্বারা বেদখলকৃত জুম্মদের হাজার হাজার ভূমি হাত ছাড়া করা।

চতুর্থতঃ এই ভোটার তালিকা মেনে নেয়ার অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালী স্থায়ী বাসিন্দাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা, স্থানীয় সংস্থা ও পার্লামেন্টে নিজস্ব পছন্দসই প্রার্থীদের প্রেরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। কেননা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে এবং অস্থায়ী বাসিন্দা ভোটারদের উপরই নির্ভর করবে নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়া না হওয়া। অর্থাৎ জুম্ম জনগণসহ পার্বত্যাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের স্বার্থ রক্ষা করে এমন কোন প্রার্থীকে জয়যুক্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। মোট কথা প্রতিটি নির্বাচনে পূর্বের মতো দালাল সুবিধাবাদীরাই নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে আসবে - যারা বিগত সরকারের এমপিদের মতো জুম্ম স্বার্থ তথা পার্বত্যবাসীর স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে, যাদেরকে আজ বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন দিয়ে দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করছে।

এরপর ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার

তাতিন্দ্র লাল চাকমা

সামন্ত সমাজের সামাজিক বৈশিষ্ট্য যদি হয় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনধারা; উৎপাদন ব্যবস্থা যদি হয় সহজ সরল এবং রাজনৈতিক রূপ রেখা হয় একনায়কতন্ত্রী আর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দায়িত্ব ক্ষমতা - তাহলে এসবের প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যাবে জুম্ম সমাজে। প্রয়াত এম এন লারমা তাই প্রায়ই বলতেন "জুম্ম সমাজ সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারায় আকন্ঠ নিমজ্জিত।" ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণেও দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজে নেতৃত্বে ছিল সামন্ত রাজা ও তার প্রতিনিধি পরিষদবর্গ। সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পর্যায় পর্যন্ত এই সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব টিকে ছিল এবং তার অবশিষ্টাংশ আজো জুম্ম সমাজে বিদ্যমান।

কিন্তু পৃথিবীর কোন সমাজ চিরদিনের জন্য স্থির থাকে না। ক্রমে ক্রমে সমাজ পরিবর্তিত হতে থাকে। সমাজ পরিবর্তনের এই ধারা অনুযায়ী সামন্ত সমাজও ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। গ্রাম সমাজ নগর সমাজে বিকশিত হয় এবং এই নগর সমাজে গড়ে ওঠে তেজারতি কারবার। গড়ে ওঠে ব্যবসা বাণিজ্য এবং জন্ম লাভ করে ব্যবসায়ী শ্রেণী।

সমাজের ক্রমবিকাশের অমোঘ ধারায় জুম্ম সমাজেও সে রকম ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠতো এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হতো। কিন্তু বৃটিশ শাসনের কষাঘাতে জুম্ম সমাজের ক্রমবিকাশে ব্যতিক্রম ঘটে। বৃটিশ শাসন মূলতঃ ব্যবসা ভিত্তিক হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে আপোষ করেছিল সামন্ত শ্রেণীর সাথে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্বৈত শাসন শুরু হয়। একদিকে অর্থনৈতিক জীবনে বৃটিশের শোষণ অন্যদিকে রাজনৈতিক জীবনে সামন্ত ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত হয়ে জুম্ম জনগণের মধ্যে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পারেনি। তাই উৎপাদন ব্যবস্থায় যেমনি ব্যবসায়িক পদ্ধতি গড়ে উঠতে পারেনি তেমনি রাজনৈতিক জীবনে জনগণের মধ্যে কোন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও শুরু হতে পারেনি।

জুম্ম জনগণ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে পরিচিত হয়েছে কিন্তু সে যুগেও গণতন্ত্রের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়নি। শুধুমাত্র পাকিস্তান আমলে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সেই ভোটাধিকার, সেই গণতন্ত্র জুম্ম জনগণের জন্য কল্যাণকর কিনা তা বুঝার সুযোগ পায়নি। কারণ নির্বাচিত গণ পরিষদ সদস্য, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ গোছাতেই দেখেছে। তাই তখনও গণতন্ত্রের মূল্যবোধ জুম্ম জনগণের মধ্যে গড়ে উঠতে পারেনি।

সত্তর দশকের শুরুতে জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদানের পদ্ধতি নিয়ে জুম্ম জনগণ সাধারণভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেও কি কারণে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োজন সে সব বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ৭৩ সালের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সর্বপ্রথম গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী হাতে নেয়। সে সময় জনসংহতি সমিতির সামনে সব চাইতে বড় বাধা ছিল সামন্ত নেতৃত্ব। কারণ সামন্ত ব্যবস্থা গণতন্ত্রের সরাসরি বিপরীত। জনসংহতি সমিতি অত্যন্ত সুকৌশলে সামন্ত পদ্ধতির উপর কার্যকরীভাবে আঘাত হানে। সে সময় গ্রামের নেতৃত্বে থাকতো কার্বারী, হেডম্যান ইত্যাদি মুরুব্বীরা। কিন্তু জনসংহতি সমিতির নেতা এম এন লারমা গ্রাম পঞ্চায়েত কমিটি গঠনের মাধ্যমে গতানুগতিক সামন্ত নেতৃত্বের পরিবর্তন করেন। কিন্তু সে সময় সামন্ত নেতৃত্বকে সরাসরি আঘাত না করে এমন কৌশল অবলম্বন করেন যাতে সামন্ত নেতৃত্ব ঐ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে ঐ পঞ্চায়েত ব্যবস্থাতেই যোগ দেয়। কারণ পঞ্চায়েত বিধি অনুসারে বিদ্যমান সামন্ত নেতৃত্বেরও পদাধিকার বলে ঐ কমিটিতে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ফলে সামন্ত নেতৃত্ব এই ব্যবস্থাকে বিপজ্জনক মনে করেনি। ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত কমিটি গ্রামের বিভিন্ন জ্ঞাতি গোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত হতো। কমিটি গ্রামের সামাজিক বিচার নিষ্পত্তিসহ বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে কাজ করতেন এবং গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাসহ সার্বিক উন্নয়নে দৃষ্টি রাখতেন। পাশাপাশি গ্রামের যুবকদের নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যুব সমিতি গঠন করা হতো। আবার এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটা ছিল গতানুগতিক গণতন্ত্রের ঠিক বিপরীত। এই কমিটি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে যেমনি নির্বাচিত হতো তেমনি যে কোন সময় এই কমিটিকে পরিবর্তনও ঐ গ্রামবাসীরা করতে পারতো। সেই কারণে প্রায় পঞ্চায়েতের সদস্যদের পক্ষপাতিত্ব করা, একপেশে বিচার করা কিংবা ঘুষ বা উপঢৌকন গ্রহণের মত খারাপ প্রবণতাগুলো দেখা দিতে পারতো না। জনগণের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার ফলে এবং সমাজে বিনা খরচে সুবিচার পাওয়ার কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। মূলতঃ এটাই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র আন্দোলনের সব চাইতে শক্ত ভিত্তি। তখনকার সরকার অবশেষে এই গ্রাম পঞ্চায়েত পদ্ধতির উপর আঘাত করলেও

ততক্ষণে জুম্ম জনগণ নিজেদের অধিকার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। ফলে সরকারী বাহিনীর দ্বারা নানাভাবে আঘাত করা হলেও এই পঞ্চায়েত প্রথাকে আর কখনই ভেঙ্গে দেয়া সম্ভব হয়নি। প্রচন্ড চাপের মুখে কিছু কিছু পঞ্চায়েত কর্মীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হলেও জুম্ম জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে এবং সংগোপনে আবার পঞ্চায়েত পুনর্গঠন করেছে নিজেদের প্রয়োজনে। তাই তখনকার সময়ে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হয়েছিল যা আর কখনও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে গণতন্ত্রের শক্ত ভিত্তি তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে মূলত দু'টা দিক সুস্পষ্ট। তার একটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালীরাসহ জুম্ম জনগণের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা, অন্যটি হচ্ছে পশ্চাৎপদ জুম্ম জনগণের আর্থ-সামজিক জীবনে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। গণতন্ত্র ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটি যথাযথভাবে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যদি রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে যাবতীয় উন্নয়নের কাজ সম্পাদন করা না হয় তাহলে সেই উন্নয়ন কখনই সাধারণ জনগণের কাছে পৌছতে পারবে না। সেই আগের মতই আমলাতন্ত্রের অতল গহ্বরে যাবতীয় উন্নয়ন নিষ্ফল পরিণত হয়ে যাবে।

কিন্তু যেটা দুভার্গ্যজনক সেটা হচ্ছে জনগণের এই গণতান্ত্রিক অধিকারকে বাস্তবায়ন না করে চরমভাবে অবহেলা করা হচ্ছে এবং যাবতীয় উন্নয়ন সামগ্রী মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের দুর্নীতির গহ্বরে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য জেলাগুলোতে প্রত্যক্ষ গণভোটে নির্বাচন হওয়ার বিধান আছে এবং বিভিন্ন জাতিসমূহের প্রতিনিধি রাখার বিধান রয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে এই তিন জেলা পরিষদ অগণতান্ত্রিকভাবেই পরিচালিত হয়ে আসছে।

গণতন্ত্রের প্রথম এবং প্রধান বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া। এই তত্ত্বকে মনে রেখেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধরে রাখার জন্যই চায় এই পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকুক। তাই চুক্তির প্রথম খন্ডে প্রথম কথাটাই লেখা হয়েছে এইভাবে "উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।" এই কথাটার অর্থ জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অনুপাত রাখা হয়েছে - তিন ভাগের দুইভাগ হবে উপজাতি আর তিনভাগের একভাগ হবে অ-উপজাতি। এই সংখ্যানুপাতটা নির্ধারণ করার পদ্ধতি হিসেবে চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে অ-উপজাতির মধ্যে যারা স্থায়ী বাসিন্দা অর্থাৎ যাদের বৈধ জায়গা জমি আছে তারাই ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ তা না হলে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে এসেই যদি ভোটাধিকার পায় তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এতই সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে যে পরে তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐতিহাসিক কারণে এটা ছিল একটা যুক্তিসংগত সমাধান। কিন্তু চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেও নানা অজুহাতে তা মেনে চলা হচ্ছে না। বর্তমান কালে সংসদ নির্বাচনের জন্য যে ভোটার তালিকা তৈরী করা হয়েছে তাতে সেনা সদস্য, বিডিআর, আনসার, পুলিশ, বহিরাগত ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, কুলি মজুর ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়া আসা সেটেলারদেরও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকেই পদদলিত করা হচ্ছে। এটা না করলেও সমগ্র বাংলাদেশের কোন ক্ষতি হয় না। কেননা সেনা সদস্যসহ অন্যান্য সকলের সুনির্দিষ্ট নিজস্ব ঠিকানা আছে। ঐ ঠিকানায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে আইনের কোন বাধা নেই এবং তাদের মৌলিক অধিকারও তাতে খর্ব হয় না। তাই যারা মৌলিক অধিকার খর্ব করার যুক্তি দিয়ে প্রণীত ভোটার তালিকা বলবৎ রাখতে চায় তাদের যুক্তি ধোপে টেকে না। বরঞ্চ বলা যায় তারা কেউ জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্মান করে না। এখানে যুক্তি দেখানো হয় 'সেটা শুধুমাত্র পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের বেলায় প্রযোজ্য' কিন্তু জাতীয় সংসদে যেখানে সমগ্র দেশের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণীত হয় বা বাতিল হয় সেখানে কি জুম্ম জনগণের প্রতিনিধি পাঠাবার কোন অধিকার থাকবে না? তাহলে জুম্ম জনগণের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা কি তা কিভাবে জাতীয় সংসদ জেনে নেবে ? জুম্ম জনগণের যদি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার করা হয় তাহলে জাতীয় সংসদে নিজেদের প্রতিনিধির মাধ্যমে কথা বলার অধিকার থাকবে না কেন? গণতন্ত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এ সবই স্বীকৃত। এই অধিকারের জন্যই জুম্ম জনগণ বিগত তিন দশক ধরে আন্দোলন করে আসছে এবং আজও সেই অধিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। একটা জাতিগোষ্ঠীর জন্য এই যে গণতান্ত্রিক অধিকার বাংলাদেশের সুশীল সমাজ ও শাসকগোষ্ঠীরা কি বোঝে না? সব চাইতে ভাল গণতন্ত্র হয়তো তারা বোঝে, নিজেদের জন্য দাবীও করে কিন্তু অন্যজনের জন্য ছাড় দিতে তারা হয়তো নারাজ। কিন্তু এর পেছনে কারণটা কি থাকতে পারে? বাংলাদেশ সরকার যখন চুক্তি করেছিল নিশ্চয় সে সময় এ বিষয়ে তাদের দূরদর্শী চিন্তার

অভাব ছিল না এবং জনসংহতি সমিতিকে গোপন সশস্ত্র আন্দোলনের বাইরে গণতান্ত্রিক পরিবেশে নিয়ে আসার যতটা সম্ভব ছাড় দেয়ার কথা তারা ভেবেছিল। কিন্তু এখন?

বর্তমান অবস্থায় এই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা কি হতে পারে? শোনা যায় স্থানীয় স্বার্থবাদীরা প্রচার করে যে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পাহাড়ী, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানও পাহাড়ী এমনকি পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীও পাহাড়ী। তাহলে সবই তো গেল, বাঙালীদের জন্য আর থাকলো কি? তাতে তারা ভুলে যায় যে বাংলাদেশের যত মন্ত্রী যত ক্ষমতার মসনদ সবই বাঙালীদের করায়ত্ব। আর তা কখনও কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তারপরেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এই অধিকার দিলে কি সমস্ত বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যায়? কিন্তু এসব কথা সবাই বলে না। দেখা যায় যারা আগে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে একচেটিয়া ক্ষমতা ব্যবহার করেছিল সেই ব্যুরোক্রেসি আর সেই সঙ্গে ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা যারা সীমাহীন শোষণ নির্যাতন, দুর্নীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে অভাবনীয় স্বার্থ সিদ্ধি করেছিল, যারা চিরজীবন ধরে জুম্মদের অবজ্ঞা করে যাচ্ছে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে তারাই তো ভাবে এই জুম্মদের জন্য এতকিছু দেবার কি দরকার? এরা তো বন্য, যাযাবর, এমনকি তারাই নাকি জুম্মদের চাষাবাদ শিখিয়েছে এবং লুঙ্গি পরার শিক্ষাও তারা দিয়েছে। এই ধরনের অবজ্ঞা ও অবহেলাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারকে তারা পদদলিত করতে চায়। সেই সঙ্গে জুম্ম চেলা চামুন্ডারাও অবশ্যই যোগ দেয়। তাদের চরিত্রে দ্বৈতরূপ। জুম্মদের অধিকার নিয়ে আলোচনা হলে তারা তখন জান কোরবানী দিতেও প্রস্তুত কিন্তু জনসংহতি সমিতি যখন বলে যে, চুক্তি মোতাবেক ভোটার তালিকা করা না হলে নির্বাচন প্রতিরোধ করবে। তখন কিন্তু চিৎকার দিয়ে বলে ওঠেন "এটা কিভাবে সম্ভব হবে? আর নির্বাচন জুম্মরা না করলে বাঙালীরাই তো খালি মাঠে সমস্ত সুযোগ পেয়ে যাবে? না, আমরা বাঙালীদের বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নই।" কিন্তু এই কথা বলার পেছনে যা সত্য তা হচ্ছে "আমার দরকার আপাততঃ কিছু, পরে যা হবার তা হবে? এই সুযোগে কিছু একটা হতে পারলেই তো নিজের।" এই বক্তব্য কিন্তু সাধারণ জনগণের নয়। সেই চির পরিচিত দালাল প্রতিক্রিয়াশীলরাই যারা চামচাগিরি করতে নিজেদের চরিত্রে কালিমা লেপন করতে সদা প্রস্তুত। সেই সাথে বর্ণচোরা নব্য দালাল সেই চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপ যারা মুখে ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবীটা স্বীকার করে কিন্তু কাজে নির্বাচন করার জন্য জোরে সোরে ঢাকঢোল পেটায় - তারা চেহারায় ভিন্ন কিন্তু চরিত্রে এক ও অভিন্ন। এগুলোও বড় বড় বাধা। জুম্ম জনগণের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই সময়ে একদিকে অগণতন্ত্রী আমলারা চরম সুবিধাবাদী ও দাঙ্গাবাজ বাঙালী ব্যবসায়ীরা এবং সেই সাথে যুক্ত হচ্ছে চির পরিচিত দুলাগোষ্ঠী যারা কেউ নবীন কেউ প্রবীণ - এ সবই প্রতিবন্ধক যাদের ডিঙাতে না পারলে জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

যুক্তিতে যে যাই বলুক জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দুটো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। সামন্ত ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে অবশ্যই গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে এটা একটা স্বাভাবিক পরিণতি। আর জুম্ম জনগণ ইতিমধ্যে গণতন্ত্র চর্চা করেছে এবং তার ফলাফলও জেনে গেছে। এই দুই কারণে জুম্ম জনগণকে কোন অবস্থাতে গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন থেকে বিরত রাখা যাবে না। জুম্ম জনগণের সচেতন অংশটি অবশ্যই জুম্মদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবী করে। এই দাবী থেকে সরে যাওয়ার অর্থ উদ্ভট দালালের মাতলামী করা।

জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী দেওয়া। কারণ সুনির্দিষ্ট বাসস্থানের অভাবে জুম্ম জনগণকে যাযাবরের মত দিন কাটাতে হয়। জুম্ম জনগণ আর যাযাবর থাকতে চায় না। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে যে কোন নাগরিকের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পাবার অধিকার থাকে। জুম্ম জনগণও উদ্বাস্তু হিসেবে অবশ্যই পুনর্বাসন পাবার দাবী রাখে। এ সবই জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার।

জুম্ম জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিশেষতঃ স্বাধীনভাবে পেশা গ্রহণের অধিকার পেতে হবে। কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থায় জুম্ম জনগণের ব্যবসা বাণিজ্য করার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। চাকুরী পাবার নিশ্চয়তা নেই। এসবই পার্বত্য চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত আছে। তাই জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

জুম্ম জনগণকে একটি বিষয়ে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্র থাকতে পারে, সরকারও গণভোটে নির্বাচিত হতে পারে কিন্তু তার মধ্যেও অনেক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অগণতান্ত্রিক মনোভাব থাকতে পারে। এটা কোন জনগোষ্ঠী বা জাতির প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এর প্রতিফলন দেখা দেবে। তাই স্মরণ রাখতে হবে যে, এই অধিকার পরিপূরণের জন্যই প্রয়োজন হবে দীর্ঘ কঠোর ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের। এই সংগ্রাম থেকে সরে যাওয়ার অর্থ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারকেই অবহেলা করা অথচ গণতান্ত্রিক অধিকারের বিকল্প জুম্ম জনগণের কিছুই নেই।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও চুক্তি বিরোধীদের ভূমিকা

খাগড়াছড়ি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিগত ১ আগষ্ট ২০০১ চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপ খাগড়াছড়িতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে খুব ঘটা করে জনসমাবেশ করেছে। জনসমাবেশের আগে মাইকিং ও সমাবেশ পূর্ব মিছিল করেছে এবং তাতে পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত সদয়তার সাথে প্রহরা দিয়ে মিছিল ও সমাবেশ করতে সহযোগিতা দিয়েছে। এই দৃশ্য খাগড়াছড়িবাসী প্রত্যেকে কৌতূহলের সাথে দেখেছে। কৌতূহল জেগেছে এই কারণে যে ইতিপূর্বে যখনই তারা সমাবেশ করেছে তখনই কোন না কোনভাবে বাধা পেয়েছে। আর এবারের সমাবেশটা হলো তিন বিদেশীকে অপহরণের পরবর্তী সময়ে। ঐ অপহরণের সময় জুম্ম জনগণ ও দেশী-বিদেশী সবাই জেনে গেছে যে চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপের লোকেরাই এ সন্ত্রাসী কাজ চালিয়েছে। কিন্তু সে সন্ত্রাসীদের যে ধাঁচে সহযোগিতা দেয়া হয়েছে তাতে মনে হয়েছে তৎকালীন সরকারী দলের কোন প্রোগ্রামে পুলিশ প্রশাসনের এত সতর্ক দায়িত্ব পালন। তাই বিশেষতঃ খাগড়াছড়িবাসী পাহাড়ী-বাঙালী সবাই উৎসুখ্য নিয়ে লক্ষ্য করেছে।

সমাবেশ হবার কথা ছিল ৩০ জুলাই। কিন্তু ৩০ ও ৩১ জুলাই আওয়ামী লীগের হরতাল হবার কথা ছিল। তাই প্রশাসনের পরামর্শক্রমে চুক্তি বিরোধীরা ১ আগষ্ট এই সমাবেশ পিছিয়ে নেয়। এই সমাবেশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগে থেকে গুঞ্জন শুনা যাচ্ছিল যে তারা এই সমাবেশে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ঘোষণা দেবে। এখানে উল্লেখ করার বিষয় যে তারও আগে ২৯ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্যে চুক্তি মোতাবেক ভোটার তালিকা সংশোধন করা না হলে ঐ নির্বাচন প্রতিরোধ করার ঘোষণা দেয়। সেই দিক থেকে চুক্তি বিরোধীরা কি ঘোষণা দেয় তা দেখার বিষয় ছিল। কিন্তু তারও আগে খাগড়াছড়ির আকাশে-বাতাসে শুনা যাচ্ছিল যে খাগড়াছড়ির সেনাবাহিনীর মদদে তারা নির্বাচন করার কথা ঘোষণা দেবে। ঠিক বাস্তবে শুনা গেলোও তাই।

চুক্তি বিরোধীদের এই সমাবেশ সবকিছু মিলে ছিল নির্বাচন-পূর্ব শো-ডাউন। কিন্তু এসব বিষয়ে জানার পর লড়াকু রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব কোনরূপ বাধা প্রদান করেননি। কিন্তু তথাকথিত বিশাল সমাবেশে লোকজনের উপস্থিতি ছিল সর্বসাকুল্যে ৩/৪ শত জন। এরমধ্যে বেশীর ভাগই তাদের সশস্ত্র ক্যাডার যাদেরকে লুঙ্গি পরিয়ে পাবলিক বেশে নিয়ে আসা হয়েছিল। নির্বাচনের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজনের পেছনে ছিল বাবু অনন্ত বিহারী খীসা ও বাবু উপেন্দ্র লাল চাকমার সক্রিয় দুই হাত। নেপথ্যে ছিল প্রশাসনের কালো একটা হাত।

সমাবেশে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পানখাইয়া পাড়াস্থ মারমা সংসদ ওবিএমসি-এর কতিপয় নেতা। তারা অহর্নিশ পরিশ্রম করেছে যাতে জনসংহতি সমিতির পাল্টা শক্তি একটা প্রদর্শন করতে পারে। ঐ সমাবেশে মারমা সংসদের নেতারা স্বশরীরে উপস্থিত হননি বটে কিন্তু যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজনে তাদের কোন ঘাটতি ছিল না। কারণ ঐ জাতীয় সংসদের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মারমা নেতাদের মংক্যচিং চৌধুরী অথবা মমংচি বাবুকে ঐ চুক্তি বিরোধীরা মনোনয়ন দিতে পারে বলে একটা সূক্ষ্ম প্রলোভন ছিল। কিন্তু বিধিবাম। সমাবেশের পরে যারা উদ্যোগ আয়োজন করেছিল তারা পুরোদমে হতাশ হয়ে পড়ে। কারণ চুক্তি বিরোধী নেতারা পুরো ৩০/৪০ হাজার ভোটার দিয়ে সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু সমাবেশে যোগ দেয় মাত্র ৩/৪ শত জন লোক। শরণার্থী নেতা হিসেবে উপেন্দ্র লাল চাকমা যোগ-বিয়োগ করে দেখলেন শরণার্থীদের থেকে ২০ হাজার ভোট পেলেও চুক্তি বিরোধীদের কয়েকশত ভোট দিয়ে কাজ হয় না। অপরদিকে মারমা নেতারাও ভাবলেন - মারমা ভোট না হয় ১২/১৪ হাজার পাওয়া যাবে। তারপরে চুক্তি বিরোধী ভোট ১০ হাজার হলেও সুবিধে হয় না। তাই সকলেই হতাশ।

কিন্তু জুম্ম জনগণ মনে করে চুক্তি বিরোধীরা মুখে আর যাই বলুক তারা আসলে দু'ভাগে ভাগ হতে বাধ্য। কারণ চুক্তি বিরোধীদের একটা অংশ আছে তারা অত্যন্ত স্বার্থপর। তারা ইতিপূর্বেও আওয়ামী লীগের প্রার্থী কল্পরঞ্জন চাকমার কাছ থেকে নানাভাবে সুবিধাদি গ্রহণ করেছে। বর্তমানেও সুযোগ নিচ্ছে, ভবিষ্যতেও তাই নেবে। সেই অংশটা অবশ্যই যাবে কল্পরঞ্জনের পক্ষে। আর চুক্তি বিরোধীদের যে অংশটা নেতৃত্বের উচ্চাভিলাষী তারা যাবে উপেন্দ্র লাল চাকমার পক্ষে। কারণ তারা চায় তাকে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা অনুকূল নেতৃত্ব খাড়া করতে যার ছত্রছায়ায় তারা বেড়ে উঠতে পারবে। অবশ্য এমন কথাও শোনা যায় মারমা সংসদের নেতারা যতই চুনেপুটি হোক অথবা কুয়ার ব্যাঙই হোক তাদেরকে জনসংহতি সমিতি সহজে আক্রমণ করবে না। তাই তাদেরকে দিয়েও নেতৃত্ব খাড়া করা যায়। এটা বাড়াবাড়ির এক পর্যায়ে গিয়ে পানখাইয়া পাড়াতে প্রকাশ্যে চুক্তি বিরোধী অফিস খোলার কথাও প্রচার করেছে। যাই হোক পরিস্থিতিটা কিন্তু সকলেই খুব সতর্কভাবে অবলোকন করছেন। চুক্তি বিরোধীদের এই যে নির্বাচনী উল্লম্ফন তা কিন্তু সুবিধাবাদীদের উর্বর মস্তিস্কের আবিষ্কৃত একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতলব - যার নীল নকশা বহুদিন ধরে লালিত হয়ে আসছে। সেই কারণে তারা সমাবেশের আগে একটা প্রচারপত্র ছেড়েছিল তাতে লেখা ছিল 'ভাইয়ে ভাইয়ে আর হানাহানি নয় - জেএসএস-র প্রতি আহ্বান' ইত্যাদি। প্রকাশ্য সমাবেশে

প্রধান বক্তা সশস্ত্র গ্রুপের নেতা সঞ্চয় চাকমা ঘোষণা করেছিলেন 'আমরা চুক্তি বিরোধী নই'।

রাজনৈতিক জীবনে তাদের এটা একটা চমৎকার ডিগবাজী। কারণ যারা শুরু থেকেই পার্বত্য চুক্তিকে মানে না বলে ঘোষণা দিয়েছে (চুক্তি বিরোধীরা) তারা নাকি এখন চুক্তি বিরোধী নয়, যেন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। তারা আরো বলছে যে চুক্তি মোতাবেক ভোটার তালিকা সংশোধন করার জনসংহতি সমিতির কর্মসূচীকে তারা সমর্থন দেবে। কিন্তু আবার চুক্তি বহির্ভূত তালিকা দিয়েও নির্বাচন করবে এটা যেন জল্লাদের কোলে মাথা রেখে জল্লাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। এধরনের শিশুসুলভ রাজনীতি শুধু জুম্ম জনগণকেই হতাশ করবে।

বাস্তব পরিস্থিতিটা আর যাই হোক - নির্বাচন আসছে, নির্বাচন তারা করবেই। নির্বাচনের এই ফড়িয়া থেকে তারা মুক্ত থাকতে পারবে না। কেননা তাদের অতীত কার্যকলাপই অন্ততঃ সেটা প্রমাণ করে। কারণ অতীতের এক সময়ে এই চুক্তি বিরোধী চক্রটি জনসংহতি সমিতিরই অঙ্গ সংগঠনের সদস্য ছিল। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় জনসংহতি সমিতির সাথে তাদের মত বিরোধ হয়। তারা চেয়েছিল স্বাধীনভাবে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। কিন্তু জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিত এই রূপ - যদিও সত্তর দশকের স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়ে জনসংহতি সমিতি নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু তখনকার প্রেক্ষাপট আর '৯৬ সালের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। নব্বই দশকের শেষে সেটেলারদের উপস্থিতি ও তাদেরকে ভোটার তালিকায় ব্যাপক হারে অন্তর্ভুক্ত করা, পুলিশ, বিডিআর, আনসার, সেনাবাহিনীসহ সকলকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাতে জুম্ম জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর নেই। তদুপরি প্রশাসন কোন না কোনভাবে পক্ষপাতিত্ব করবে। সেখানে স্বাধীনভাবে ভোটে জিতে যাওয়াটা শুধু অনিশ্চিতই নয় রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার। তাই জনসংহতি সমিতির প্রস্তাব ছিল আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচনী সমঝোতা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। কিন্তু জনসংহতি সমিতির এই বক্তব্যটা তারা কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়নি এবং নিজেদেরকে অনেক বেশী জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব মনে করতো। তারা চায়তো জনসংহতি সমিতি গোপন সংগঠনে থাকুক এই সুযোগে প্রসিত-সঞ্চয়রা এমপি বনে গিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফিগার হয়ে পরিচিতি লাভ করুক। শেষ পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির বিরোধিতা করে অনন্ত বিহারী খীসা প্রমুখ নেতাদেরকে দিয়ে নির্বাচন করায়। ফলাফলে দেখা গেছে অত্যন্ত লজ্জাজনক পরিণতি যাতে প্রার্থীদের জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিটা আরো বেশী প্রতিকূল। তা সত্ত্বেও এই চুক্তি বিরোধী গ্রুপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছে এবং তাই করবেও। কিন্তু বরাবরের মতোই তারা ব্যর্থ জিজির গলায় চক্রান্তের যুপকাষ্ঠে বলি হবে সেটাই নিশ্চিত'। কারণ জনসংহতি সমিতিকে তার দাবী থেকে সরে যেতে বাধ্য করবার জন্য কুচক্রি মহল সেই ষড়যন্ত্রের জালই বুনছে। আর নির্বাচনের নামে সেই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই ভরাডুবি ঘটাবে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে চুক্তি বিরোধীরা নির্বাচনে অংশ নিয়ে ঘর শত্রু বিভীষণের ভূমিকাই পালন করতে পারবে মাত্র।

---

৫ পৃষ্ঠার পর

কেন জনসংহতি সমিতির নির্বাচন বিরোধিতা?

কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন এই সুবিধাবাদী দালালদেরও নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়ার বা দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যাবে যখন জুম্ম জনগণ মাইক্রোস্কোপিক সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। কেননা যে হারে বহিরাগত বাঙালী জনসংখ্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃদ্ধি হচ্ছে আগামীতে জুম্ম একেবারে মাইক্রোস্কোপিক সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে পড়বে - যেখানে জুম্ম ভোটারদের কানাকড়ি মূল্য থাকবে না। যেমনটি আজকে সমতল জেলাগুলোতে আদিবাসীদের মনোনয়ন দেয়া বা দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োজনও বোধ করে না দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দলগুলো।

আর, পঞ্চমতঃ, এই ভোটার তালিকা ও এই ভোটার তালিকা দিয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচন মেনে নেয়া, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোট দেয়ার অর্থ জুম্ম স্বার্থ তথা পার্বত্যাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের স্বার্থ পরিপন্থী কাজ করা, এতদাঞ্চলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া এবং স্বার্থের সাথে চরম বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করা, সর্বোপরি দালাল ও সুবিধাবাদী ভূমিকা গ্রহণ করা।

তাই আসুন, আমরা আসন্ন ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঐক্যবদ্ধ ও সর্বাত্মকভাবে বর্জন ও প্রতিরোধ করি। নির্বাচনে ভোট দান, পোলিং এজেন্ট নিয়োগ, নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জয় আমাদের নিশ্চিত। সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরদানে বাধ্য করার মাধ্যমে জুম্ম জনগণ প্রমাণ করেছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে যে কোন ন্যায়সঙ্গত দাবী অর্জন সম্ভব। স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবী ন্যায়সঙ্গত দাবী। তাই আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধ করি, নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধের আন্দোলন দুর্বার গতিতে অব্যাহত রাখি তাহলে আমাদের জয় সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

খাগড়াছড়িতে নির্বাচন রঙ্গ

খাগড়াছড়ি থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সমগ্র বাংলাদেশে ২৮ ও ২৯ আগষ্ট ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেযার তারিখ। খাগড়াছড়িতে ঐ দুই দিনে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছে মোট ১২ জন। তম্মধ্যে ৭ জন পাহাড়ী ও ৫ জন বাঙালী। দেশের সকল এলাকার মত বাঙালীরা যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং আনন্দ উল্লাস করবে তা স্বাভাবিক কিন্তু জুম্মদের অবস্থা এখানে ভিন্ন।

ঐ দুই দিন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আহুত হরতালের দিন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে চুক্তি মোতাবেক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি। সর্বোপরি প্রণীত ভোটার তালিকার মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে সূক্ষভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হচ্ছে। আর গণতন্ত্রের প্রধান বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচনে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য বর্তমানে মরিয়া হয়ে সংগ্রাম চালাচ্ছে। কিন্তু এসব রাজনৈতিক দল জুম্ম জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এই পার্বত্য চট্টগ্রামে বজায় থাকুক তা চায় না। নিজেদের জন্য চায় গণতন্ত্র আর জুম্মদের জন্য চায় একনায়কতন্ত্র, এই হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্র। তাদের উদ্দেশ্য শুধু শাসন করে যাওয়া। সমস্যার সমাধান নয়।

যাই হোক, নির্বাচন হবে তাতে আপত্তিকর কিছু নেই। কিন্তু যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৪৭ সালে ছিল ২.৫% ভাগ বাঙালী আর বাদবাকীরা জুম্ম কিন্তু সেখানে বর্তমানে পাহাড়ী বাঙালী প্রায় সমান সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জুম্ম জনগণের সচেতন অংশের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বেড়ে গেছে যে এভাবে হলে জুম্মদের অস্তিত্বই টিকে থাকবে না। এ সরল সিদ্ধান্ত সকলের জানা থাকা সত্ত্বেও জুম্ম প্রার্থী দাঁড়িয়েছে ৭জন। তারা কেউ কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেও বেশীর ভাগই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি। তাই তাদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সহজে হবে বলে মনে হয় না। বর্তমানে খাগড়াছড়িতে ১ লাখ ৫৩ হাজার হচ্ছে বাঙালী ভোটার আর ১ লাখ ৭০ হাজার হচ্ছে পাহাড়ী ভোটার। এই পাহাড়ী ভোটারগুলো কোন না কোনভাবে যে ভাগ হয়ে পড়বে তা নিশ্চিত। বিগত '৯৬ সালের নির্বাচনে পরাজিত বিএনপি প্রার্থী পেয়েছিলেন ৪৮ হাজার ভোট। বিজয়ী প্রার্থী পেয়েছিলেন ৬২ হাজার ভোট। এই ৬২ হাজার ভোট এখন কয়েকভাগে বিভক্ত হতে বাধ্য। কারণ এই বিভাজনটা গড়ে তুলেছে জুম্মদের মধ্যকার আত্মঘটিত অনৈক্য।

এখানে বিশেষভাবে তামাশার বিষয় হয়েছে চুক্তি বিরোধী প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপের নাটিকাটি। কারণ জুম্ম সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে এই চুক্তি বিরোধী গ্রুপটি বিশেষতঃ উচ্ছন্ন, উদ্ভ্রান্ত কিছু যুবক রোমান্টিকতাবশতঃ ক্ষুদে অস্ত্র হাতে নিয়ে জুম্ম জনগণকে নিয়ে নির্মম তামাশা শুরু করে দিয়েছে। কেননা কিছু দিন আগে থেকে শোনা যাচ্ছে ২০-৩০ হাজার ভোট দিয়ে উপেন্দ্র লাল চাকমাকে তারা সাহায্য করবে। উপেন্দ্রবাবু নিজেও বহুবার একথাটা লোকজনের সামনে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য জাতীয় বিশ্বাসঘাতক কল্পরঞ্জন চাকমাকেও প্রসিত-সঞ্চয় চক্ররা সমর্থন করে। অন্যদিকে মারমা উন্নয়ন সংসদ (মাউস) এর কতিপয় নেতাকেও অনুরূপ আশ্বাস দিয়েছে বলে মাউসের নেতারা প্রচার করেন। আর আওয়ামী লীগের সাথে এই চুক্তিবিরোধী গ্রুপটির যে লেজে গোবরে সম্পর্ক তা কারোর অজানা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রসিত খীসা নিজেই একজন প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত '৯৬ এর নির্বাচনে প্রসিতের বাবা অনন্ত বিহারী খীসা খুব নামীদামী শিক্ষক হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ফলাফলটা এতই লজ্জাজনক ছিল যে তার ঘোর সমর্থকরাও একথা বললে মুখ বন্ধ করে থাকে। একই খেলায় নেমে পড়েছে তার ছেলে প্রসিত। লোকে বলাবলি করে এটা বোধ হয় তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রোগ।

আরো এক ধরনের মতিভ্রম দেখা যাচ্ছে মাউসের কতিপয় নেতার মধ্যে। তাদের প্রথমে হিসেব ছিল চুক্তি বিরোধীদের সমর্থন তারা পাবে। পরে তা যখন পরিস্কার হলো যে চুক্তি বিরোধীরা নিজেরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তখন বলা শুরু করেছে যে মারমা ভোট কম করে হলেও ৩০ হাজারের উপরে আছে। হেনতেন করতে করতে সব ভোট ভাগাভাগি হলে সব মারমাদের ভোটগুলো পেয়েও হয়তো তাদের পোয়াবারো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাদের মাথায় এই হিসেবটা নেই যে খাগড়াছড়ির এই মারমারা বহুধা বিভক্ত। বর্তমান প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপেই বহু মারমা কর্মী আছে এমনকি খোদ মাউস থেকে ক্যজরী মারমা ও কিরন মারমা নিজেরা চুক্তি বিরোধী নেতা। কাজেই চুক্তি বিরোধীদের সাথে একটা অংশ অবশ্যই যাবে। আর আওয়ামী লীগের মিছিল মিটিঙেও জুম্মদের মধ্যে মারমাদেরই বেশী দেখা যায়। কাজেই সে দিকে যাবে একটা দল। বিএনপির সাথে জড়িত সাবেক জেলা পরিষদের সদস্যরা। সেদিকে যাবে একটা দল। জনসংহতি সমিতির সাথে তো আছেই, সর্বোপরি মাউস নেতারা নিজেরাই দ্বিধাবিভক্ত। মমংচিং মার্মা মাউসের সহ সভাপতি, কংজরী মারমা মাউসের সভাপতি উভয়ে এখন হবু সাংসদ। তাদের উভয়ের মধ্যেকার

দ্বন্দ্বটা জনগণের নিত্য প্রচলিত একটা প্রবাদের মত। অতএব মারমারা ৩০ হাজারের বেশী হলেও কমপক্ষে ৬ ভাগে বিভক্ত। এই হিসেব মত জনগণ রায় দিয়ে ফেলেছে এবং বলতে শুরু করেছে যে এরা আসলে আদা ব্যাপারীদের মতই নির্বাচন ব্যাপারী ছাড়া আর কিছুই নয়। শেষ পর্যন্ত অবস্থা বুঝে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা ছাড়া তাদের জন্য বিকল্প কিছুই ছিল না।

অন্যদিকে সাবেক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা প্রকাশ্যে বলেছেন তাকে নাকি দেবতারা ভোট দেবে। জনগণের পক্ষ থেকে এ প্রশ্নটা আসা স্বাভাবিক। কারণ যার পায়ের নীচে মাটিও নেই সে আবার নির্বাচনে জিদ ধরে বসে থাকে। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে কে ভোট দেবে আপনাকে? উত্তর দিয়েছেন - 'দেবতারা ভোট দেবে'। এই দেবতা কারা এ প্রশ্ন ছিল জনগণের। এখন আস্তে আস্তে তার গুমোর কিছুটা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। তার কয়েক প্রকারের দেবতা আছে। তৃতীয় নম্বরের দেবতা হচ্ছে একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা, দ্বিতীয় দেবতা হচ্ছে তার কালো টাকা। ঐ কালো টাকা দিয়ে নাকি স্থানীয় প্রশাসনের সকল কর্মকর্তাদের হাত করে নেবেন। যেহেতু জনসংহতি সমিতি নির্বাচন বয়কট করছে সেহেতু গ্রামাঞ্চলের লোকেরা যদি ভোট কেন্দ্রে না যায় তখন ঐ সরকারী কর্মকর্তারা বিনাবাধায় তার নৌকায় ভোট দেবে। পয়লা নম্বরের দেবতা হচ্ছে - প্রসিত সঞ্চয় চক্র। কিছুদিন হলো প্রসিত সঞ্চয় চক্রের সশস্ত্র গ্রুপে বিভিন্ন জায়গায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে দলত্যাগ করেছে। কয়েকজন সরকারের কাছেও আত্মসমর্পণ করেছে সশস্ত্রভাবে। ঐ সশস্ত্র সদস্যদেরকে তারা বুঝাচ্ছে - 'আওয়ামী লীগের সাথে বিশেষতঃ কল্পরঞ্জনের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে। তারা ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলে একটা বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা সমাধা করবে। তাহলে তোমরা কয়েকদিন ধৈর্য ধরতে পারছো না কেন'? এখন খুব গোপনে শোনা যাচ্ছে যে প্রসিত-সঞ্চয়রা নির্বাচনে এমন একটা নাটক করবে যাতে করে তারা একদিকে প্রকাশ্যে আসার সুযোগ পাবে আর নিজেরা দেশে-বিদেশে প্রচার করার সুযোগও পাবে। বাংলাদেশ সরকার জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে এ সুযোগটা লুফে নিতে মোটেই দেরী করেনি। এবং বলছে সন্তু লারমা কিভাবে নির্বাচন প্রতিরোধ করে তা দেখা যাবে।

এই তিন প্রকারের দেবতার হদিস পেয়েছে জুম্ম জনগণ এবং বলছে প্রসিত-সঞ্চয় শেষ পর্যন্ত জুম্ম জনগণকে নিয়ে এই নিষ্ঠুর খেলা খেলতে শুরু করেছে। নিজেদের জন্য প্রচার দরকার যদি হয় তাহলে বিগত বিদেশী অপহরণ ঘটনায় তারা তো দেশে-বিদেশে সন্ত্রাসী হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পেয়ে গেছে। আর দালালীও যদি করতে হয় তাহলে কল্পরঞ্জনের দালাল কেন হবে? কারণ কল্পরঞ্জনতো একজন নিজেই দালাল - সে দালালের আরো দালাল! মানে উপ-দালাল!

যেই প্রসিত চক্রের জন্ম বেইমানী থেকে সেই প্রসিত চক্র আজো তাই করছে। তার এতদিনের লালিত মুখোশ এবারেই জুম্ম জনগণের কাছে খুলে গেল। কেননা সেই প্রসিত চক্ররা এক সময় জনসংহতি সমিতির অঙ্গসংগঠনের লোক ছিল। বিগত '৯৬ এর নির্বাচনে তাদের আত্মপ্রচারমুখী মনোভাব উচ্চাভিলাষে পরিণত হয়ে জনসংহতি সমিতির সাথে বেইমানী করে আলাদা চক্র গঠন করে। এখন দেখার বিষয় উপেন্দ্র লাল চাকমা ও কল্পরঞ্জন চাকমার ন্যায় আরো কতজনের সাথে বেইমানী করে।

এদিকে শ্রীযুক্ত কল্পরঞ্জন চাকমার দেবতা বিশ্বাসটা অত্যন্ত ঘনীভূত হয়েছে দেখা যায়। সম্প্রতি পানছড়িতে একজন দেবতা ভিক্ষুকের আবির্ভাব হয়। এতে বিনাবিলম্বে ঐ কল্পরঞ্জন হন্তদন্ত হয়ে আশীর্বাদ নিতে ছুটে যান দলবল নিয়ে। সঙ্গে যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা মহোদয়, জাহেদুল আলম সাহেবসহ কত সাঙ্গ-পাঙ্গ ছিলেন। তিনি তখন অত্যন্ত নিবিড়ে একনিষ্ঠ মন দিয়ে ঐ দেবতা ভিক্ষুককে প্রণাম করেন এবং নগদ ১২ হাজার টাকা দান করেন। প্রতিদানে নির্বাচনে জেতার আশীর্বাদ নেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে জুম্ম জনগণ আবিষ্কার করলো যে ঐ দেবতা ভিক্ষুকটি হচ্ছে বাবুছড়া এলাকার একজন চুক্তি বিরোধী লোক। সে অবৈধ গোপন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ঐ গোপন প্রেম চালিয়ে যাবার জন্য গরু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। তখন এলাকাবাসীরা তাকে শাস্তি দেয়। শাস্তিতে তার মাথার চুল তিন ফালা করে কেটে দেয়। বেচারা ঐ লজ্জাটা ঢাকার জন্য পুরো মাথাটা ন্যাড়া করে শেষমেশ একটা রংবস্ত্র সংগ্রহ করে পানছড়িতে পলায়ন করলে জঙ্গলে লোকচক্ষে ধরা পড়ে। ঐ লোকচক্ষুকে ধোকা দিতে সে তপস্যায় নিমগ্ন হয়। এদিকে নির্বাচনে ছটফট করা কল্পবাবু খবর পেয়ে তড়িঘড়ি করে দেবতা ভেবে দান দক্ষিণা করে পরম আশীর্বাদ নিয়ে নির্বাচন বৈতরণীতে এসে পৌঁছেছেন। সত্যবাদী জুম্ম জনগণের কাছে এটাই হচ্ছে নির্বাচন রঙ্গ।

সংসদ নির্বাচন কোন পথে?

তনয় দেওয়ান

আসন্ন ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে দেশের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সকল প্রকার রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ব্যাপক নির্বাচনী মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। ডানপন্থী বুর্জোয়া দলগুলো মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক দলগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে জয়লাভ তথা ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রার্থী ও কর্মীদের মনোনয়ন নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ আবারো তাদের চরম নীতিহীনতার পরিচয়কে তুলে ধরেছে। তাই তাদের নীতি আদর্শের বালাই বলতে আর কিছুই নেই। সবারই লক্ষ্য যে কোনভাবে ক্ষমতা দখল করা, নিজেকে এমপি হিসেবে নির্বাচিত করা।

অন্যদিকে নির্বাচনকালীন ৩ মাসের জন্য গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূর্বেকার যে কোন সরকারের চেয়ে বেশীমাত্রায় চাপের মুখে রয়েছে। প্রশাসনকে নিরপেক্ষ করার নামে কর্মকর্তা পর্যায়ে গণহারে বদলীকে কেন্দ্র করে প্রধান দু'টো রাজনৈতিক দল সমালোচনা বা সমর্থনে মেতে উঠেছে। বরাবরের মতো এবারের নির্বাচনেও সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ভূমিকাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অস্বীকার করতে সক্ষম হয়নি। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে জাতীয় 'নিরাপত্তা সেল' গঠন করে সেনাবাহিনীর সংযুক্তিকে আরো বেশী বিতর্কিত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর এ ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন ও নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেনাবাহিনী মূলতঃ চুক্তিবিরোধীদের মদদ ও জনসংহতি সমিতিকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে তাদের দায়িত্বকে পরিচালিত করবে, নির্বাচনকে ঘিরে নয়।

৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে নিঃসন্দেহে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবীতে অটল রয়েছে এখনো। এব্যাপারে তারা সরকারের উচ্চ পর্যায়সহ নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত সম্ভব সকল স্তরে ধর্ণা দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন। সর্বশেষ এই বিষয়ে কেবলমাত্র ধর্ণা বা আলোচনা নয়, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকেও প্রতিরোধ করা হবে বলে জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে সরকারের উচ্চমহলে বাববার তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এখনো তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবার পরে ৮ আগস্ট ২০০১ প্রধান উপদেষ্টার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান-এর বৈঠকেও এ নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা ও দাবী জানানো হয়।

জনসংহতি সমিতির স্থায়ী বাসিন্দা বিষয়ে দাবীটির প্রধানতম ভিত্তি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং এর উপর ভিত্তি করে সংশোধিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'খ' খন্ডের ৯ ধারায় রয়েছে ঃ

> **"বিদ্যমান ১৭ ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবেঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।"**

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩ নম্বর ধারায় স্পষ্ট লেখা হয়েছে যে,

> **'অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বলতে যিনি উপজাতি নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।'**

এখানে সংবিধানের ১২২ ধারার (ঘ) উপধারায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গে স্পষ্টতঃ বলা আছে যে,

> **"তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন।"**

শুধু তাই নয়, চুক্তির 'গ' খন্ডের ১১নং ধারায় আছে যে,

> **"১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।"**

এখানে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার কোন পরামর্শ বা সুপারিশকে সরকার আমলে আনছেন না অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে। যা রীতিমত সরকারের একগুয়েমী ও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র না হয়ে থাকতে পারে না। নির্বাচন প্রতিরোধ করার সাংগঠনিক পদ্ধতির সাথে সাথে জনসংহতি সমিতি সরকারের সাথে আলোচনার পথও সমানভাবে খোলা রেখেছে। প্রথমে ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময়ে জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে বিগত ১০ মে ২০০০ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। তারপর ২২ মে ২০০০ আনুষ্ঠানিকভাবে জনসংহতি সমিতির

সভাপতির সাথে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বৈঠকেও এব্যাপারে জোর দাবী উথাপন করা হয়। জনসংহতি সমিতির পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ৪ জুলাই ২০০১ অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করেন।

৬ আগষ্ট ২০০১ তিন পার্বত্য জেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলের সাথে নির্বাচন কমিশনের সহকারী সচিব এর সাথে সাক্ষাৎ ও পুনরায় স্মারকলিপি পেশ করা হয় এবং অবৈধ ভোটারদের বাতিল আবেদনের ফরম চেয়ে আইনী লড়াই এর উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু এতেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন কমিশন অসহযোগিতা করে, ভোটার কর্তনের ৯ নং ফরম সরবরাহ করতে নির্বাচন কমিশন অস্বীকৃতি জানায়।

পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছেও বিষয়টি উত্থাপিত করা হয়। ৭ আগষ্ট ২০০১ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার আলোচনা হয়। ৮ আগষ্ট ২০০১ তারিখে বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার এ বিষয়ে আলোচনা হয়। আবার ১০ আগস্ট ২০০১ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জেনারেল এরশাদ এর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার মধ্যে আলোচনায় এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সর্বশেষ গত ২৮ ও ২৯ আগষ্ট ২০০১ (মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন) তিন পার্বত্য জেলায় জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে হরতাল পালন করা হয়েছে। এখান থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১ রাঙামাটিতে গণসমাবেশের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই গণসমাবেশ থেকে ২৯, ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত টানা তিন দিনের হরতাল কর্মসূচী ঘোষিত হতে পারে।

এমনি টানাপোড়েনের সময়ে সদ্য গজে উঠা ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট সংক্ষেপে ইউপিডিএফ এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের দলের নেতা প্রসিত বিকাশ খীসাকে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি আসনে এবং বান্দরবানে রাংলাই ম্রোকে প্রার্থী করে নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছে। তাদের এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ চুক্তি বিরোধী আপোষহীন ধারা থেকে সেটেলার বাঙালী ও সেনাবাহিনী সদস্যদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা দানের স্বীকৃতিকেই প্রমাণ করেছে।

ধারণা করা হচ্ছে যে, প্রসিত বিকাশ খীসা দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে নির্বাসন অবস্থা হতে নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেকে জনসমক্ষে তুলে ধরার অপচেষ্টা করছেন। সরকারের কাছে নিজেকে গণতান্ত্রিক (?) পথে বিশ্বাসী হিসেবে প্রমাণ করা এবং তার দলের স্বশস্ত্র সদস্যদের উপর চাপ কমাবার উদ্দেশ্যেই ইউপিডিএফ নির্বাচন করছে - এতে জয়ের এক চুল সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও। অন্যদিকে প্রসিতের দল যারা ভারী করেছে তাদের গায়ে সুবিধাবাদের পরগাছা দিন দিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। তাই নির্বাচনে যেন সবাই কমবেশী অর্থ কামাতে পারে এজন্য তারা নির্বাচনকে কাজে লাগাচ্ছে মাত্র।

এছাড়া প্রসিত বিকাশ খীসা তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য এখন ক্ষমতার রাজনীতির দিকে মোড় ঘোরাচ্ছেন। এটা হলো চরম বামপন্থী হঠকারী অবস্থান হতে চরম সুবিধাবাদী ডানপন্থী অবস্থানে সরে আসার সুস্পষ্ট লক্ষণ। সমাজের সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত মহলের এতে সামান্য সমর্থন থাকলেও সাধারণ জনগণের কোন সাড়া মিলবে না। এটা প্রসিতের আরো একটি রাজনৈতিক হঠকারিতার পদক্ষেপ মাত্র। এতে শুধু যে জনগণ থেকে প্রসিত খীসা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন না; কল্পরঞ্জন, বীর বাহাদুর ও দীপংকরের সাথে গড়ে উঠা এতদিনকার সুমধুর ঐক্যেও ফাটল ধরবে। আর এটা করতে প্রসিত মূলতঃ বাধ্য হচ্ছে তার সামরিক বাহিনী ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের গাইডের কারণে।

মূখ্যতঃ জনসংহতি সমিতি যেখানে ভোটার তালিকায় অস্থায়ী বাসিন্দাদেরকে (অনুপ্রবেশকারী বাঙালী, সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর, ভিডিপি ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের) ভোটার তালিকায় সংযুক্ত করার বিষয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ও স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য জোরালো আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচন বয়কট ও প্রতিরোধ পর্যন্ত করছে সেখানে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নিজেদেরকে কতটুকু আপোষহীন প্রমাণ করছে তা রীতিমত সন্দেহের উদ্রেক করছে। তাই কল্পরঞ্জন, দীপংকর ও বীর বাহাদুর এর মতো জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ক্ষমতালোভীদের সাথে প্রসিতের পার্থক্যটা এখন আর চোখে পড়ে না।

এবারের নির্বাচনী বৈতরণী পেরোবার জন্য প্রার্থীদের মনভোলানো ও লোভাতুর প্ররোচনা থেকে সাধারণ জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। বিগত সময়ে যারা জুম্ম জনগণের ভাগ্যের সাথে ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে ছিনিমিনি খেলা খেলেছে তাদের অস্তিত্ব চিরতরে মুছে দিতে হবে। বিপ্লবী সেজে যারা জুম্ম জাতির অভ্যন্তরে বিভক্তি আর ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত শুরু করেছে তাদের নির্বাচনী মোহকে ভেঙে দিতে জনগণও যোগ্য জবাব দেবে।

জুম্ম জনগণের ত্যাগ তিতিক্ষা আর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত চুক্তির মাধ্যমে যে আইনানুগ অধিকার লাভ করা সম্ভব হয়েছে তার বাস্তবায়নে সাময়িক যে কোন লোভ লালসা থেকে বিরত থেকে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের নির্বাচনী ষড়যন্ত্রকে শক্তহাতে প্রতিরোধ করে যেতে হবে যতদিন না পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়িত হয়।

জুম্ম জনগণের সংগ্রাম, সংঘাত, সমঝোতা এবং জেএসএস বিরোধিতা

জীবন চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম শুরু হয় তার প্রথম থেকে যুক্ত হয় ভ্রাতৃঘাতি সহিংসতা, একই সাথে বিভিন্ন সময়ে চলতে থাকে সমঝোতাও। সশস্ত্র সংগ্রাম আর সহিংসতার এক পর্যায়ে ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বর নির্মমভাবে নিহত হন এম এন লারমা ও তাঁর আট সহযোদ্ধা। এ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় নিজেদের মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বী অথচ স্বজাতির লোকেরাই এই পৈশাচিক আক্রমণ চালায়। এই মৃত্যুতে আমরা কেউ খুশী হতে পারিনি। মর্মাহত হয়েছে আপামর মানুষ। যারা হত্যাকান্ড চালিয়েছে তারাও কতটুকু উল্লসিত হতে পেরেছে আমার সন্দেহ আছে। তবে অনেকে জানে যে হত্যাকারীরা হত্যা পরিকল্পনার সাফল্যে খাসী-মুরগী যা হাতে পেয়েছে তা দিয়ে আনন্দ উল্লাস করেছে। তবে নিঃসন্দেহে আনন্দ উল্লাসটা ছিল নিতান্তই সাময়িক। রক্তক্ষয়ী ঐ হত্যাকান্ডের ফলে কোন পক্ষ কি লাভবান হতে পেরেছে? আদতেই আমাদের কেউ লাভবান হয়নি। লাভবান করা হয়েছে শত্রুপক্ষকে। সামগ্রিকভাবে জুম্মজাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে একথা সবারই স্বীকার করতে হবে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আভ্যন্তরীণ কোন্দল আর সমঝোতার অভাব ছিল ১০ই নভেম্বর হত্যাকান্ডের ফলশ্রুতি? ১৪ জুন ১৯৮৩ সালের আভ্যন্তরীণ সংঘাত সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের ঘটনা আজো অনেক পার্টি কর্মীর স্মরণ থাকবে। গোলকপতিমা চেঙ্গী উপত্যকার একটি নিভৃত অরণ্যাঞ্চলে দ্রুত নিষ্পত্তিপন্থীদের সাথে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইপন্থীদের মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়। সমূহ পরাজয় দেখে দ্রুত নিষ্পত্তিপন্থীরা সমঝোতার প্রস্তাব দেয়। সমঝোতার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করা হয়। উক্ত অনাক্রমণ চুক্তি বা 'ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া' নামের সমঝোতা কত বড় বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে তার পরিণতি দেখা যায় ১০ নভেম্বরের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞে। ফলে সমঝোতা, আন্তরিকতা, উদারতা ইত্যাদি শব্দের অর্থ অনেকের কাছে আজ পানসে হয়ে গেছে। সমঝোতা মানেই এখন সংশয়। সেই বিভেদপন্থীরা ১৯৮৫ সালে ২৯ এপ্রিল রাঙ্গামাটির ষ্টেডিয়ামে এক সমর্পণ সমঝোতায় সমাপ্তি টানে সংগ্রামের। সেদিনও আমাদের ভাইবোনেরা ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে ওদের স্বাগত জানায়। ঠাট্টা-মসকরাও হয়েছে, হয়েছে অনেক বিদ্রুপ। তবুও সমাজ ওদের কাছে টেনে নিয়েছে। না নেবেই বা কেন। ওরাও আমাদের ভাই, আমাদের সমাজের সন্তান। ওদের হত্যা করে কি সেদিন পাঁচদফা অর্জন করা যেত। মোটেই না। অথচ ওদের দ্বারাও আন্দোলনের ক্ষতি কম হয়নি। কিন্তু জনসংহতি সমিতি হত্যার রাজনীতি থেকে দূরে ছিল বলেই সংঘাত থেমে গেছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যে সংগ্রাম তাতে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে জনসংহতি সমিতি আর অংশ নিয়েছে কম বেশী সবাই। এদের মধ্যে দালালীপনা যেমন করেছে অনেকে আবার চরম বিশ্বাসঘাতকতাও করেছে। সংগ্রামে আত্মত্যাগ আর আত্মঘাত দু'টোই হয়েছে। এই আত্মত্যাগ পার্টির কর্মীরা যেমন করেছে তেমনি পার্টির কর্মী নয় এমন সাধারণ মানুষও করেছে। অপরদিকে সবচেয়ে আত্মঘাতী ভূমিকা নিয়েছে পার্টির কর্মীরাই। আন্দোলনকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে পার্টি কর্মী, পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ মানুষ। পার্টির সাথে বেঈমানী করেছেও পার্টি কর্মীরা, পার্টি কর্মীর ভাই বন্ধু বা ছেলে মেয়ে, পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় জীবিকা নির্বাহ করেছে এমন মানুষ পার্টির বাইরে যারা আর্মীদের সাথে সম্পর্ক করে বা সরকারের সাথে নানাভাবে সহযোগিতা করে জেনে না জেনে বা স্বার্থের জন্য সামগ্রিকভাবে ক্ষতি করেছে তাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। সামগ্রিক অর্থে আত্মমুখী সংঘাতের ফলে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের যে সংগ্রাম তা বার বার সমঝোতার পথে ঠেলে দিয়েছে আমাদের। আর সমঝোতা মানেই হলো সমর্পণ। ক্ষুদ্র শক্তির সাথে বৃহৎ শক্তির সমঝোতার অর্থই হলো ক্ষুদ্র শক্তির সমর্পণ। আমাদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম নেই। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আভ্যন্তরীণ সংঘাতের ক্ষেত্রে আমরা সমঝোতা করতে ব্যর্থ হয়েছি। এজন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এক অর্থে এই ব্যর্থতাই আমাদের আন্দোলনকে এগোতে দেয়নি।

সমঝোতার কথা আজ কে না বলছে। ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, সাধারণ মানুষ সবাই চায় ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত নির্মূল করতে সমঝোতা হোক। জনসংহতি সমিতির কর্মীরাও সমঝোতার কথা বলছে না তা নয়। সমিতির নেতৃত্বও চায় সংঘাতহীন আবহাওয়া। আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে চলতেই হবে। এই সমঝোতাও বিবিধ রকমের হতে পারে, হতে পারে বিবিধ পরিস্থিতিতে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের অধিকারের জন্য রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে সংগ্রাম গড়ে তোলে পার্বত্য চট্টগ্রাম

জনসংহতি সমিতি। জনসংহতি সমিতির এই আন্দোলনকে ঘিরে পরবর্তীতে গড়ে ওঠে নানা মতের নানা নেতৃত্বের সংগঠন। দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠন গঠিত হয়। তার কোনটা পুরোপুরি রাজনৈতিক চরিত্রের আবার কোনটা সাংস্কৃতিক বা মানবাধিকারের জন্য। যা কিছুই হোক, যে নামেই হোক সবার উদ্দেশ্য কিন্তু জুম্মদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক অধিকারের জন্য। বাংলাদেশ সরকারের নিপীড়ন থেকে জুম্মদের মুক্ত করার জন্য। বাংলাদেশ সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য। জুম্ম জনগণের দূঃখ দুর্দশার কথা দেশে-বিদেশে প্রকাশ করার জন্য। এদের মধ্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা সংগঠনও আছে যেগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নানা কাজে জড়িত হয়। ট্রাইবেল কনভেনশন, ত্রিপুরা উন্নয়ন সংস্থা, পরবর্তীতে চাকমা উন্নয়ন সংস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনকল্যাণ সমিতি, গণ প্রতিরোধ কমিটি, নয় দফা রূপরেখা বাস্তবায়ন কমিটি, শান্তি কমিটি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণ পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক ইন ইউরোপ, জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক ইন এশিয়া প্যাসিপিক, জুম্ম পিপলস এলায়েন্স ইত্যাদি অসংখ্য সংগঠন গড়ে তোলা হয়। অতি সম্প্রতি গড়ে উঠেছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট। এদের কোনটা জনসংহতি সমিতির সমর্থনে বা এর পরামর্শে, কোনটা আর্মীর দ্বারা সরাসরি জনসংহতি সমিতির বিরোধিতার জন্য, আবার কোনটা সরকার রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য আবার কোনটা স্বাধীনসত্ত্বা নিয়ে গড়ে তোলা হয়।

জনসংহতি সমিতি চায় জুম্মদের সকল শক্তিকে সংঘবদ্ধ করতে। বিভিন্ন উদ্যোগ একত্রিত করতে। অথবা তার কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল উদ্যোগের সমন্বয় সাধন করতে। কেন না আমরা দুর্বল আর শত্রু আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। সুতরাং নিজেদের মধ্যেকার সকল শক্তির একই জায়গায় সমাবেশ করা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু না তা হয়নি। বরং উল্টোটাই হয়েছে বেশী। কেবল বিভক্ত হইনি। হয়েছি বিক্ষতও। অর্থাৎ অধিকাংশ জুম্ম জনগণ মানতে পারলেও অনেকেই মূল শক্তি জনসংহতি সমিতির আন্দোলনকে মানতে পারেনি। কেবল মানতে না পারাই শেষ কথা নয়। আমরা চূড়ান্তভাবে ক্ষতি করেছি বা ক্ষতি করার চেষ্টা করেছি আন্দোলনের মূল শক্তিকে। অথচ মূল শক্তিকে আরো শক্তিশালী করা উচিত ছিল। নানা কারণে নানা পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজের কিছু লোক জুম্ম জাতিকে ভালবাসলেও, জুম্ম জাতির জন্য ভালো কিছু করার মানসিকতা লালন করলেও এমন কি জনসংহতি সমিতির আন্দোলনকে স্বীকার করলেও তার নেতৃত্বকে মানতে পারেনি। পার্টির পরামর্শে পার্টিকে আমব্রেলা (মূল) সংগঠন মেনে নিয়ে জুম্ম জনগণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারিনি আমরা। এজন্য কি কেবল জনসংহতি সমিতি দায়ী? আপনারা নিজেরাও কি মোটেই দায়ী নন?

কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে নাকি একনায়কতন্ত্রের আর গণতন্ত্রের। জনসংহতি সমিতি নাকি চায় একনায়কত্ব। আর অন্য যারা দেশ জাত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তারা চায় গণতন্ত্র। তাদেরও আলাদাভাবে জুম্ম জাতির জন্য কাজ করার অধিকার রয়েছে। শুধু জনসংহতি সমিতি হলেই কেবল দেশ সেবা বা জাত সেবা করা যায় তাতো নয়। সুতরাং আলাদাভাবে, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজের মত করে জুম্ম জাতির জন্য কাজ করা চাই। যার যেমন খুশী তেমন সংগঠন করে জুম্ম জাতির সেবা করা আর কি। ক্ষুদ্র একটা জাতিসত্বার ভেতর আট দশটা এমনকি আরো বেশী দল করার অর্থই কিন্তু একটা। আর তা হলো বিভক্তি, ভাঙন। মূল আন্দোলনকে দুর্বল করা। এটাই যদি গণতন্ত্র হয় তাহলে আপাতত আমাদের তেমন গণতন্ত্র চর্চা না করাই উচিত। আর তা করতে গিয়ে যখন কোন কোন বিষয় মূল আন্দোলনের সাথে সংগতিপূর্ণ না হয় বা বিরুদ্ধে যায় তখন জনসংহতি সমিতি তার বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়। আর তখনই জনসংহতি সমিতি খারাপ। পার্টি স্বৈরতান্ত্রিক। পার্টিকে গালিগালাজ। পার্টির চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার। পার্টি অগণতান্ত্রিক। পার্টি নেতৃত্ব অসহিষ্ণু। পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলনের কেবল দুর্বল দিকগুলো নিয়ে যখন সমালোচনা করেন তা পার্টি একটু অখুশী তো হতেই পারে। তা অস্বাভাবিক তো কিছুই নয়। আন্দোলনের ভাল দিকগুলো নিয়ে সমালোচনা করতে আপনাদের বাঁধে কেন। পার্টির দ্বারা কোথায় কিভাবে কখন আপনি উপকৃত হয়েছেন তা সততার সাথে বলুন। স্বীকার করুন আন্দোলনের সুফলগুলো। খোলাখুলি বলুন আন্দোলনের দুর্বল দিকগুলো কি কি। পার্টির দুর্বলতা কি কোথায়। কি করলে ভাল হয় আর কি করলেই বা ক্ষতি। সত্যিকার অর্থে এভাবেই তো আন্দোলনকে সহায়তা করতে পারেন।

পার্টি ঐক্য চায় না। পার্টি সমঝোতা চায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক এখন প্রশ্ন হলো পার্টি কার সাথে সমঝোতা করবে? যারা পার্টির খেয়ে পার্টির বিরোধিতা করে, দ্রুত নিষ্পত্তির নামে জাতীয় নেতা ও নেতৃত্বকে হত্যা করে অবলীলায়, আন্দোলনের চরম বিরোধিতা করে যারা তৃপ্তি পায়, একটু আধটু আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বিরাট কিছু করেছে বলে মনে করে অথবা আন্দোলনে কোন অবদান নেই এবং আন্দোলনের সকল সুফল ভোগ করে অথচ নিজেকে বিরাট জাতপ্রেমিক বা দেশপ্রেমিক ভাবে আর সুযোগ পেলেই জনসংহতি সমিতিকে তুলোধুনো

এরপর ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তিন বিদেশী অপহরণ নাটকের অন্তরালে-

অতি সম্প্রতি বহুল আলোচিত ও প্রচারিত একটি জিম্মি নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেলো পার্বত্য চট্টগ্রামে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যারা খবরাখবর রাখেন সে সকল তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা দেশে ও বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই জিম্মি নাটকের অন্তরালে চিহ্নিত কতিপয় মহল পালন করেছিল অভিনয়ের নানা ভূমিকা। সেই চিহ্নিত মহলগুলোর মধ্যে কেউ নিয়েছে নাট্যকারের ভূমিকা, কেউ নিয়েছে অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভূমিকা আর সফল মঞ্চায়নের জন্য কেউ নিয়েছে কলা-কৌশলীর ভূমিকা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যে যে ভূমিকাই নিক না কেন দর্শকের চোখকে তারা ফাঁকি দিতে পারেনি এতটুকুও।

উল্লেখ্য যে, গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১ইং আনুমানিক ৪ ঘটিকার সময়ে অমূল্যধন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ নামধারী চুক্তি বিরোধী একটি সশস্ত্র দল রাঙামাটি জেলা শহর হতে মাত্র ২৫ কিলোমিটার অদূরে অবস্থিত নানিয়ারচর থানার গুনিয়াপাড়া আর্মী ক্যাম্পের নিকটস্থ ১৮ মাইল নামক স্থান হতে ৩ জন বিদেশীকে অপহরণ করে। বিদেশীরা ডেনমার্কের উন্নয়ন সংস্থা ডানিডা নিযুক্ত সড়ক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান কেমসেক্স ইন্টারন্যাশনালের পক্ষে রাঙামাটি-মহালছড়ি সড়কের প্রশস্ততা বাড়ানোর কাজে তথ্যানুসন্ধানের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। সেদিন তারা রাঙামাটি থেকে একটা গাড়ীতে চড়ে যাবার পর ফেরার পথে বাঁশের বান্ডিল দিয়ে সৃষ্ট ব্যারিকেডের সম্মুখীন হন এবং উক্ত ৩ বিদেশীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। কর্তৃপক্ষকে মুক্তিপণ বিষয়ে অবহিত করার জন্যে গাড়ীর ড্রাইভারসহ ইংল্যান্ডের নাগরিক ডেভিড ওয়েস্টনকে ছেড়ে দেয়। অপহৃত তিনজন বিদেশীদের মধ্যে মি. টারবেন নিকেলসন (৩৮) এবং নিলস হুলগার্ড (ফারগ্রান্ট নয়) (৬৩) হলেন ডেনমার্কের অধিবাসী এবং টিম সেলবি (২৮) হলেন ইংল্যান্ডের অধিবাসী। অপহরণকারীরা মুক্তিপণ হিসেবে ৯ কোটি টাকা দাবী করে। যা মি. ডেভিড তার কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার পর জানা যায়।

অপহরণের টানা একমাস ধরে অভিনয়ের পর ১৭ই মার্চ ২০০১ইং চূড়ান্ত মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে অপহৃত বিদেশী নাগরিকরা মুক্তি লাভ করেন। জিম্মি উদ্ধার তৎপরতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা উদ্ধারের বর্ণনা দেন এভাবে সেনাবাহিনীর একটি দল ঝটিকা অভিযান চালিয়ে কাউখালী সেনাক্যাম্পের ৪-৫ কিলোমিটার উত্তরে দার্য্যা পাড়ার নকশাছড়া এলাকার একটি পরিত্যক্ত কুঁড়েঘর থেকে এই তিন বিদেশীকে উদ্ধার করে। এর আগে সেনাবাহিনীর সঙ্গে অপহরণকারীদের গুলি বিনিময় হয় এবং অপহরণকারীরা পালিয়ে যায়। পরে জিম্মিদের উদ্ধারের পাশাপাশি সেনা সদস্যরা ওই এলাকা থেকে দু'টি দেশীয় এলজি ও কিছু গুলির খোসা উদ্ধার করে। তবে অপহরণকারীদের কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। গুলি বিনিময়কালে উভয় পক্ষের কেউ হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। গুলি বিনিময়কালে সেনাবাহিনী ১২৩ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। সেনা কর্মকর্তারা বলেছেন, গুলি করতে করতে অপহরণকারীরা পালিয়ে গেছে। ......তবে অন্যান্য সূত্রের দাবি, অপহরণকারীদের সঙ্গে প্রশাসনের সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে অপহৃতরা মুক্তি পেয়েছেন। (সূত্র ঃ প্রথম আলো ১৮/৩/২০০১)।

বস্তুতঃ এই বিদেশী অপহরণ ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোন একক ঘটনা নয়। এই ঘটনা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এবং বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই সংঘটিত করা হয়েছে। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর বর্তমানে ইউপিডিএফ নামধারী ছাত্র পরিষদের একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চুক্তি বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ডাক দেয়। এ গোষ্ঠী মুখে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের কথা বললেও জনসংহতি সমিতি সদস্য ও সমর্থকদের হত্যা, অপহরণসহ চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা ব্যতীত তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন আদায়ের জন্য তাদের কোন কর্মসূচী পরিলক্ষিত হয়নি। নিজেদের হীন কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন এমপিসহ সরকারের একটি বিশেষ মহল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্তব্যরত সেনাবাহিনীর একটি অংশ ইউপিডিএফ নামধারী চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সদস্যদের নাশতকামূলক তৎপরতায় মদদ দিতে থাকে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকেই সরকারের এই বিশেষ মহল নানাভাবে চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। চুক্তি লংঘন করে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে বহিরাগত বাঙালী সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন, জেলা প্রশাসক কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের সরকারী

নির্দেশ, সেটেলারসহ বহিরাগত ব্যবসায়ী ও সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রভৃতি কার্যকলাপসহ নানা কায়দায় ও নানা কৌশলে চুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধিতা করে চলেছে। তাদের এই চুক্তি পরিপন্থী তৎপরতার পেছনে ক্রিয়াশীল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে তাদের হীন সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ক্ষেত্রে দলীয়করণের মাধ্যমে একচ্ছত্র দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়া, সর্বোপরি জুম্ম জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার সরকারী ষড়যন্ত্রের সাথে তাবেদারী গান গাওয়া।

স্বাভাবিকভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনে সোচ্চার জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে সরকারের এই চিহ্নিত বিশেষ মহল গোড়া থেকেই উঠে পড়ে লেগে যায়। এক্ষেত্রে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে আর্বিভূত হয় ইউপিডিএফ নামধারী চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র গ্রুপ। 'শত্রুর শত্রু নিজের বন্ধু' - এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ভিত্তিতে চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র গ্রুপের সাথে সরকারের এই বিশেষ মহল গড়ে তোলে ঘৃণ্য গোপন আঁতাত। সরকারী ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে তাদেরকে দেয়া হয় প্রশাসনিক নিরাপত্তা। নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রায়শঃ ছাত্র লীগসহ দলীয় সদস্যপদ ও টিকেট দিয়ে থাকে এসব চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসীদের। এতে করে আইনী হয়রানি থেকে থাকে তারা নিরাপদ। তাদের স্বার্থ হচ্ছে চুক্তি বিরোধীদের মদদ দিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে কোণঠাসা করা এবং কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে নিজেদের একচ্ছত্র দুর্নীতি অব্যাহত রাখা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্তব্যরত সেনাবাহিনীর একটা অংশও এই ন্যাক্করজনক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের উদ্দেশ্যে হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির পরিবেশ ভিত্তি তৈরী করা এবং তা অটুট রাখা। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে তারা চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সদস্যদের হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস প্রভৃতি নাশকতামূলক কার্যকলাপকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাভাবে মদদ দিতে থাকে যাতে তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠে। ফলে দেখা যায় যে, দীঘিনালা উপজেলাধীন বাবুছড়া সেনা জোনের ১০০/১৫০ গজের মধ্যে অবস্থিত মডেল স্কুলে চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সদস্যরা অবস্থান করলেও এবং সেখানে প্রতিনিয়ত চাঁদাবাজি ও নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়ে থাকলেও জোন কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করে না। খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়িতে এবং রাঙ্গামাটি জেলাধীন কুতুকছড়িস্থ যাত্রী ছাউনিতে চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সদস্যরা যখন চাঁদা আদায় করে এবং সুযোগ পেলেই জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের অপহরণ করে তখন সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা শান্ত ছেলের মতো অবলোকন করে, ক্ষেত্র বিশেষে এক সঙ্গে বসে প্রকাশ্যে চা-নাস্তাও করে থাকে। বেশী উদাহরণের দরকার নেই। এ প্রসঙ্গে ১৭/১২/২০০০ইং সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত গোলাম মোর্তোজার একটি রিপোর্ট উল্লেখ করা যেতে পারে। এ রিপোর্টের বয়ান নিম্নরূপ-

"রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি সড়ক। নানিয়ারচর ছেড়ে এগিয়ে চলছে বাস। ঘিলাছড়ি বাজারের কাছে আসতেই থামানো হলো বাস। যারা বাস থামালো সংখ্যায় তারা তিনজন। পরনে জলপাই রঙের পোশাক। হাতে কাটা রাইফেল, কোমরে গুলির বেল্ট। বাসে উঠে তল্লাশি করলো। বাংলায়, কারো সঙ্গে চাকমা ভাষায় কথা বলল। যেখানে এই ঘটনা ঘটছিল সেখান থেকে আর্মি ক্যাম্প আশি-নব্বই গজ দূরে। ক্যাম্প থেকে আর্মিরাও এই সশস্ত্রদের দেখছিল। কিন্তু কিছুই বলল না। সশস্ত্র তিনজন ড্রাইভারের কাছে জানতে চাইলো তাদের দেয়া 'টোকেন' আছে কিনা। চাঁদা নিয়ে তারা একটি নির্দিষ্ট টোকেন দেয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এরা শান্তিচুক্তি বিপক্ষ প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপের সদস্য। খাগড়াছড়িতে জনসংহতি সমিতির সম্মেলন হবে। এই সম্মেলন উপলক্ষে রাঙ্গামাটি থেকে চুক্তির পক্ষের অনেক নেতা-কর্মী খাগড়াছড়িতে যাচ্ছেন। পথে তাদের ধরার জন্যই বিপক্ষ গ্রুপ এই তল্লাশি চালাচ্ছে। ...... প্রসিত-সঞ্চয় গ্রুপের একটি সূত্র জানায়, 'শান্তিবাহিনীর গেরিলারা দীর্ঘদিন জঙ্গলে ছিল। আর্মির মতো একটি শক্তিশালী বাহিনীর সঙ্গে তারা যুদ্ধ করেছে। জঙ্গলের যুদ্ধে তারা অসম্ভব রকমের পারদর্শী। তাই যুদ্ধগুলোতে আমরা পরাস্ত হচ্ছি। আর্মি-পুলিশের সমর্থন তো আমাদের পক্ষে। সূত্র জানায়, 'আর্মি-পুলিশ আমাদের সশস্ত্র সদস্যদের গ্রেপ্তার করে না। কিন্তু যুদ্ধের সময় তো আর আমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে না। তাছাড়া আমাদের কাছে খুব ভালো অস্ত্রও নেই।"

সশস্ত্রবাহিনীর সহায়তা ছাড়াও সারা দেশের ন্যায় এখানে যুক্ত হয়েছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর অপতৎপরতা। আইএসআই পার্বত্য চট্টগ্রামে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি কাজে লাগিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। পাশাপাশি চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র গ্রুপকে পরোক্ষভাবে মদদ দিয়ে চলেছে যাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অব্যাহত রাখা

যায় এবং সুযোগ মত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করা সম্ভব হয়। চুক্তি বিরোধীদের যেহেতু কোন নীতির বালাই নেই, সেহেতু তাদের সাহায্য পেলেই হলো। তাতে তাদের স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ দিলেই হলো। তাই তারা লুফে নিতেও দ্বিধাবোধ করছে না উগ্র ইসলামিক সংস্থা আইএসআই-এর সাহায্যও। এ খবর মাঝে মধ্যে পত্রিকায়ও প্রকাশ হয়ে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে এই যে ষড়যন্ত্রের হাত কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা বাহ্যতঃ অসম্ভব মনে হলেও বস্তুতঃ এটাই বাস্তবতা। প্রতিক্রিয়াশীলতার রূপ কি জঘন্য ও অবিশ্বাস্য হতে পারে তা ভাবতেই অবাক লাগে।

এখন প্রশ্ন হলো - অপহরণ নাটকে কার কোন ভূমিকা ছিল এবং তাতে কোন পক্ষের কি লাভ হলো? বলা বাহুল্য অপহরণ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল ইউপিডিএফ নামধারী সশস্ত্র দলের। ইউপিডিএফ যদিও এ অপহরণের দায়িত্ব সরাসরি স্বীকার করেনি কিন্তু প্রকারান্তরে অমূল্যধন চাকমার নেতৃত্বে অপহরণকারী সশস্ত্র সদস্যরা ইউপিডিএফ এরই সদস্য বলে তাদের নেতা প্রসিত বিকাশ খীসা স্বীকার করেছে (ভোরের কাগজ ২০/৩/২০০১)। অপহরণের পেছনে ইউপিডিএফের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশী-বিদেশী দৃষ্টি আকর্ষণ ও মোটা অংকের অর্থ আয় করা (জনকণ্ঠ ২৫/২/২০০১)। এই অর্থ দিয়ে তারা আরো অত্যাধুনিক অস্ত্র কিনবে এবং এই অস্ত্রের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের হত্যা, অপহরণসহ ব্যাপকভাবে নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে সক্ষম হবে।

অপহরণের পর সরকার যখন আলোচনার উদ্যোগ নেয় তখন চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সদস্যরা মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা ও এমপি দীপংকর তালুকদারের সাথেই একমাত্র আলোচনা করতে প্রস্তুত বলে জানায়। কারণ এতে করে তাদের নিরাপত্তা এবং মুক্তিপণ আদায়ও নিশ্চিত ও সহজতর হয়ে থাকে।

একাধিক সূত্র জানিয়েছে, অপহৃত ৩ বিদেশী প্রকৌশলী উদ্ধারে সাবেক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমার হয়ে প্রথম মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনকারী মহালছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান আর্কিমিডিস চাকমা নিজেও ইউপিডিএফ-এর একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। এক সময় তিনি যুবলীগেরও নেতা ছিলেন। সরকারী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছেও এ রিপোর্ট আছে। অপহরণকারীদের সাথে সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তাঁর মাধ্যমে। সূত্র জানায়, তাঁর মিশনের সফলতা অর্জনের সম্ভাবনাও ছিল উজ্জ্বল। কিন্তু গোপন লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে সেই সম্ভাবনার দ্বার খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেছে। অপহরণকারীরা সর্বশেষ ১ কোটি ৪০ লাখ টাকার বিনিময়ে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছিল। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় না-কি এ টাকা যোগাড়ও করা হয়। অপহরণকারীদের হাতে দেয়ার সময় দেখা দেয় ৬ লাখ টাকা। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে টাকাগুলো জঙ্গলে ছুঁড়ে মারে এবং ১ কোটি টাকা না হলে জিম্মিদের ছাড়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়ে যায়। (পূর্বকোণ ১১/৩/২০০১)।

বিদেশ থেকে ফিরে শেখ হাসিনা এক পর্যায়ে সাফ জানিয়েছিলেন দরকার হলে মুক্তিপণ দিয়ে বিদেশীদের উদ্ধার করতে হবে। তবে দেখতে হবে টাকাটা কার পকেটে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যকে সামনে রেখে বলা যায়, মন্ত্রীর সাথে অপহরণকারীদের মুক্তিপণের টাকা নিয়ে যে দর কষাকষি হয়েছে এবং ভাগাভাগির লুকোচুরি খেলা চলেছে তা তিনি অস্বীকার করতে চাইলেও এখন দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাঙামাটিতে স্থানীয় একজন সংবাদদাতা বলেন, জিম্মিদের উদ্ধারের চাইতে এখন মুক্তিপণের টাকার ভাগ পাওয়াই উদ্ধার প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্টদের কারো কারো জন্যে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাই এখন উদ্ধার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করছে (পূর্বকোণ ১১/৩/২০০১)।

উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, বিদেশী অপহরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়কারী কলা-কৌশলীরা নানাভাবে লাভবান হয়েছে। সেনাবাহিনী দেশে-বিদেশে দেখাতে পারল পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো সশস্ত্র তৎপরতা রয়েছে, পরিস্থিতি অশান্ত, তাই তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী উপস্থিতির একটা মজবুত ভিত্তি দাঁড় করাতে পারল। চুক্তি মোতাবেক সশস্ত্রবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার না করার দেশী-বিদেশী চাপের বিপক্ষে সরকার কিছু একটা যুক্তি খাঁড়া করার সুযোগ পেল। বলা বাহুল্য, এরপর থেকে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে আগের মতো টহলদারী অভিযান জোরদার করে চলেছে। মাটিরাঙ্গায় তিনজন জুম্ম রমনী ধর্ষণ তারই প্রত্যক্ষ ফসল।

আর ইউপিডিএফ তাদের উপস্থিতি দেশে-বিদেশে প্রচার করাতে পারল। মোটা অংকের টাকা উপার্জন করতে পারল অতি অনায়াসে। সেই সাথে সেই ভাগ বাটোয়ারায় অংশ বসালো বাবু কল্পরঞ্জন চাকমা ও বাবু দীপংকর তালুকদার। পাশাপাশি শত্রুর শত্রু নিজের মিত্র 'ইউপিডিএফ'কে দিয়ে জনসংহতি সমিতিকে কোণঠাসা করার কাজও শক্তিশালী হলো।

পাকুজ্যাছড়িতে সেটেলার গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ। পাহাড়ীদের প্রতিক্রিয়া।।

অতিসম্প্রতি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার জয়সেন কার্বারী পাড়া এপি ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্পের চারপাশে পাহাড়ীদের জায়গা-জমিতে প্রায় দেড় শতাধিক বাঙালী সেটেলার পরিবার নতুন বসতি স্থাপন করেছে। এই বসতি দানের পেছনে উক্ত জয়সেন পাড়া এপি ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্পসহ সেনা কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও এধরনের বসতি স্থাপনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায় যে, মহালছড়ি উপজেলাধীন পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামের অধিবাসী কতিপয় সেটেলার পরিবার তাদের আবাসনের স্থান সংকটসহ বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করে গুচ্ছগ্রামের এলাকা সম্প্রসারণের জন্য অক্টোবর, ২০০০ মাসে জেলা প্রশাসকের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করে। এপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করেই মহালছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে স্থানীয় সেনা/এপিবিএন/পুলিশ কর্তৃপক্ষ, ইউনিয়ন পরিষদ, হেডম্যানসহ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় এ সমস্যাটি উত্তরণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

কিন্তু উক্ত কার্যক্রমের অপেক্ষায় না থেকে সেনা ও এপিবিএন কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ মদদে এক পর্যায়ে সেটেলার বাঙালীরা মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি সড়কের পার্শ্ববর্তী জয়সেন পাড়া এপি ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্পের আশেপাশে পাহাড়ীদের জায়গা-জমিতে ঘর-বাড়ী তোলা আরম্ভ করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ১৩০ পরিবারের অধিক সেটেলার বসতি স্থাপন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে যাদের জমির উপর বসতি করা হচ্ছে সে সকল পাহাড়ীরা তাৎক্ষণিকভাবে জেলা প্রশাসকের নিকট আপত্তি জানায় এবং সেটেলারদের দ্রুত উচ্ছেদ করে গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দাবী জানায়। মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও লেমুছড়ি মৌজার হেডম্যান এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কম্যাণ্ডার, মহালছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে দেখা করে নাজুক পরিস্থিতির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এসময় তাঁরা পাহাড়ীদের জমির দলিল পত্রাদিও এ সকল কর্তৃপক্ষকে দেখান।

উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিন তদন্তের জন্য প্রশাসন থেকে একজন কানুনগো ও একজন সার্ভেয়ার পাঠানো হয়। সে সময় স্থানীয় মৌজার হেডম্যান শ্রী দীনেশ চন্দ্র চাকমাও সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু সেটেলাররা কানুনগো ও সার্ভেয়ারদের কাজে বাধা দেয় এবং এক পর্যায়ে ধারালো দা ও কিরিচ নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করে। ফলে তারা ভয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এমনকি তছর আলী নামে জনৈক সেটেলার কর্তৃক উক্ত হেডম্যান দীনেশ চন্দ্র চাকমার বিরুদ্ধে মহালছড়ি থানায় একটি মামলাও দায়ের করা হয়।

এপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে অতিরিক্ত প্রশাসক (সার্বিক)-কে সরেজমিন তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়। তদন্ত শেষে তাঁর দাখিল করা প্রতিবেদনে উল্লেখিত উদ্ভূত সমস্যার কারণে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে বলে তিনি তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন এবং বসতি স্থাপনকারী সেটেলার পরিবারসমূহকে গুচ্ছগ্রামে ফিরিয়ে নেওয়ার অভিমত প্রকাশ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে স্মারক নং গুচ্ছগ্রাম-৬(১০)/২০০০-৫৭১/২(১১) তারিখ ২৮-১১-২০০০ইং সেটেলারদেরকে উচ্ছেদের নির্দেশ প্রদান করা হয়। এরপর ১৩০ পরিবার থেকে শ' খানেক সেটেলার পরিবার পূর্বের পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামে চলে যায়।

কিন্তু পরিস্থিতি এখানে থেমে থাকেনি। এরপর খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কম্যাণ্ডার উক্ত পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শন করেন এবং ফেরৎ আসা সেটেলার পরিবারসমূহকে শীতবস্ত্রসহ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। পরিদর্শন কালে তিনি পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামবাসীদের দাবী যথাযথ বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং তিনি খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করে গুচ্ছগ্রামের স্থান সংকটের বিষয়টি যথার্থই প্রকট বলে অভিমত ব্যক্ত পূর্বক এই সমস্যাটি স্থায়ী সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসককে জানান। এভাবে সেনা ও এপিবিএন কর্তৃপক্ষসহ সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে বিষয়টি উস্কে দেয়া হয় এবং পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামে ফেরৎ যাওয়া সেটেলার পরিবারসমূহ এক পর্যায়ে পুনরায় এপিবি ব্যাটিলিয়ন ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় তোলা ঘর-বাড়ীগুলোতে বসতি স্থাপন শুরু করে। বর্তমানে এর সংখ্যা ১৫০ ছাড়িয়ে গেছে বলে জানা যায়। এপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক স্মারক নং গুচ্ছগ্রাম-৬(১০)/২০০০-২০০১ তারিখ ১২-০১-২০০১ইং মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে লেখা এক চিঠি প্রেরণ করেন। জেলা প্রশাসকের উক্ত চিঠিতেও উল্লেখ করা হয় যে,

'বন্দোবস্তি জমিতে ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ পাইলে খাঁচায় বন্দি অ-উপজাতীয় পরিবারসমূহ নিজেদের জমিতে চাষাবাদ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারিত'। এ অভিমত ব্যক্ত করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে সেটেলারদেরকে গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণের জন্য মদদ দেয়া হচ্ছে বলে পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন।

উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের জন্য ১২/৪/২০০১ইং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে এক সভা আহবান করেন। উক্ত সভায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শ্রী যতিন্দ্র লাল ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক, মাইসছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার, লেমুছড়ি মৌজার হেডম্যান দীনেশ চন্দ্র চাকমা প্রমূখ জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় মাইসছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের জনৈক মেম্বার জানান যে, প্রত্যেক দিন সেটেলাররা আসছে এবং জমি দখল করছে। জয়সেন পাড়া এপি ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্পের আশেপাশের এলাকা থেকে সেটেলারদেরকে দ্রুত উচ্ছেদের জন্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয় খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসককে বলেন। ১৫ এপ্রিল/২০০১ এর মধ্যে অতিরিক্ত প্রশাসক (রাজস্ব)-কে সরেজমিন তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জেলা প্রশাসক জানান।

১৩/৪/২০০১ইং খাগড়াছড়ি থেকে রাঙ্গামাটি আসার পথে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সরেজমিন উক্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জয়সেন পাড়া এপি ব্যাটিলিয়ন ক্যাম্পের কম্যাণ্ডার বলেন যে, তিনি বিষয়টি আর্মীর জোন কম্যাণ্ডারকে জানিয়েছেন এবং জোন কম্যাণ্ডার নাকি জানিয়েছেন ১৫০ পরিবার থেকে বেশী সেটেলার আসবে না।

১২/৪/২০০১ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে উল্লেখিত সেটেলারদের উচ্ছেদের নোটিশ দেয়া হয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেটেলাররা উক্ত জয়সেন পাড়া এলাকা থেকে চলে যায়নি বা তাদেরকে সরিয়ে নেয়া হয়নি।

১৯/৪/২০০১ইং খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের আহবানে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এই বিষয়টি আবারো উথাপিত হয়। সেটেলারদের উক্ত এলাকা থেকে অচিরেই সরিয়ে নেয়া হবে বলে উক্ত সভায় খাগড়াছড়ি ব্রিগেড কম্যান্ডার বলেন। কিন্তু আজ অবধি সেটেলারদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। ফলে এবিষয়টি নিয়ে মহালছড়িসহ খাগড়াছড়ি এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ইতিমধ্যে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির উপক্রম হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের শাসনামলে বাংলাদেশের বিভিন্ন সমতল জেলাসমূহ থেকে প্রায় চার লক্ষাধিক বহিরাগত বাঙ্গালীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বসতি দেয়া হয়। তম্মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আটটি উপজেলায় ৮০ (আশি)টি গুচ্ছগ্রামে ২৬,২২০ পরিবার বসবাস করছে। তাদেরকে বসতি দানের পর থেকে দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর ধরে নিয়মিত সরকারী রেশন প্রদান করা হয়ে আসছে। অধিকাংশ সেটেলারকে পাহাড়ীদের দখলীভুক্ত ও বন্দোবস্তীভুক্ত জায়গা-জমিতে বসতি দেয়া হয় এবং ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি লংঘন করে সেটেলারদেরকে অবৈধভাবে ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান করা হয়। তাই পাহাড়ী জনগণ সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসনের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে আসছে। সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতেও এ সকল সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। সেটেলারদের দ্বারা বেদখলকৃত জমি পাহাড়ীদের নিকট প্রত্যর্পনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ভূমি কমিশন গঠনের বিধান করা হয়েছে। এছাড়া সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক চলাকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলারদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া, রেশন বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদি অলিখিত ঐকমত্য হয়েছে বলে সমিতি দাবী করে আসছে।

কিন্তু চুক্তির পরবর্তীতে সরকার ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স ও আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লংঘন করে সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের ধারাবাহিক অংশ হিসেবে অতি সম্প্রতি মহালছড়ি উপজেলায় নতুন বসতি দানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ মনে করে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি দিন দিন জটিলতর এবং উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে।

রামগড়ে জুম্ম বসতির উপর হামলা ও অগ্নিসংযোগ

২৫ জুন ২০০১ইং দুপুর ১২.৩০ থেকে ৪ ঘন্টা ব্যাপী বহিরাগত সেটেলাররা খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় পৌরসভার বল্টুরাম টিলা, জগন্নাথ পাড়া, ঢেবার পাড়, সুকেন্দ্রাই পাড়া, চৌধুরী পাড়া, মাষ্টার পাড়া ও দক্ষিণ গর্জনতলী প্রভৃতি জুম্ম গ্রামে হামলা চালায়। এ হামলায় জুম্মদের ১১০টি বাড়ীঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় এবং ১১৭টি বাড়ীঘর লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়। হামলা চলাকালে জুম্মরা প্রতিরোধ করতে চাইলে সেটেলারদের হামলায় কমপক্ষে ১০ জন জুম্ম আহত হয়।

ঘটনার বিবরণ

২৩/৬/২০০১ইং আতর আলী নামে জনৈক ট্রাক ড্রাইভারকে একদল সন্ত্রাসী কর্তৃক রামগড় উপজেলার এলাকা থেকে প্রথমে অপহরণ ও পরে গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনার জের ধরে 'বাঙালী কৃষক-শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ'এর ব্যানারে রেজাউল করিম হেলাল ও ওয়ালীউল্লাহর নেতৃত্বে বহিরাগত সেটেলাররা রামগড় এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং ২৫/৬/২০০১ইং বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। রামগড় পৌর মিলনাতয়নে সমাবেশ শেষে ১০ দফা দাবী জানিয়ে রামগড়ের রাজপথে সেটেলাররা জঙ্গী মিছিল বের করে। মিছিলটির সাথে রামগড় থানার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং রামগড় থানার ওসি কাঞ্চন আলী মাহমুদও ছিলেন।

মিছিলটি মাষ্টার পাড়া এলাকায় পৌঁছলে বিক্ষোভকারী সেটেলাররা চকলেট বোমা ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মিছিলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। এরপর সেটেলাররা স্থানীয় দুটি মসজিদের মাইক থেকে প্রচার করতে থাকে যে, 'পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সন্ত্রাসীরা বাঙালী কৃষক-শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের মিছিলের উপর হামলা করেছে এবং একজন পুলিশ অফিসারসহ তিনজন বাঙালীকে হত্যা করেছে। তাই যে যেখানে থাকুন না কেন পাহাড়ীদেরকে প্রতিহত করতে এগিয়ে আসুন'। এতে মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং সেটেলাররা ধারালো কিরিচ, দা, বল্লম, আগেয়াস্ত্র নিয়ে জুম্মদের গ্রামে হামলা শুরু করে। সেটেলাররা প্রথমে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের অফিসে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। তবে অফিসটির পাশে বাঙালীদের ঘর-বাড়ী থাকায় সেখানে তারা আগুন লাগানো থেকে বিরত থাকে। রামগড়ের প্রধান সড়কের অনেক ভিতরে গলিপথ পেরিয়ে সেটেলাররা জুম্মদের বাড়ীগুলো বেছে বেছে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। এরপর একে একে বল্টুরাম টিলা, জগন্নাথ পাড়া, ঢেবার পাড়, সুকেন্দ্রাই পাড়া, চৌধুরী পাড়া, মাষ্টার পাড়া, ও দক্ষিণ গর্জনতলী প্রভৃতি গ্রামের জুম্ম ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। হামলাকারীরা প্রতি গ্রুপে ১৫০ হতে ২০০ জন করে ৬/৭ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পরিকল্পিতভাবে জুম্মদের বাড়ীঘর চিহ্নিত করে কেরোসিন দিয়ে বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়। সেটেলাররা এলোপাতাড়ী ককটেল, ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে জুম্মদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। এসময় জুম্মরা অনেকেই ক্ষেতে, অফিসে ও ব্যবসার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বেলা ১২.৩০টার দিকে এই হামলা শুরু হয়ে প্রায় ৪ (চার) ঘন্টা স্থায়ী ছিল। হামলা চলাকালে রামগড় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও কর্তব্যরত পুলিশবাহিনী নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সেটেলারদের কাছে দিয়াশলাই না থাকায় পুলিশের অনেক সদস্য তাদের দিয়াশলাই দিয়ে সাহায্য করে থাকে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

অগ্নিকান্ডে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য থৈয়াচিং মারমা, ২৩৫নং নাকাপ্পা মৌজার হেডম্যান আপ্যুচুই চৌধুরী, সাংবাদিক সুবোধ ত্রিপুরা, ছাত্রনেতা বিক্রম কিশোর ত্রিপুরার বাড়ীও সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য থৈয়াচিং মারমার বাড়ীতে আগুন লাগানোর সময় হামলাকারীদের সাথে স্বয়ং উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ওসি উপস্থিত থাকলেও নির্বিকার ছিলেন। শুধু তাই নয়, খাগড়াছড়ি জেলার জেলা প্রশাসক আশরাফুল মকবুল ও এসপি মোজাম্মেল হোসেন এসময়ে রামগড়ে উপস্থিত ছিলেন। হামলা চলাকালে তারা কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া থেকে সুকৌশলে বিরত থাকেন। এছাড়াও বিডিআর এর জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল আবু তাহের সেটেলারদের বলেন যে, আপনাদেরকে ২ ঘন্টা সময় দেয়া হলো, এসময়ে আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।'

যে সকল মহিলা বাড়ীতে ছিলেন তারা আগুন নেভানোর চেষ্টা চালালে তাদেরকে মারধোর ও ধাওয়া করা হয়। এতে অনেকেই বিডিআর আউটপোষ্টে আশ্রয় পাবার জন্য ছুটে যান। কিন্তু বিডিআর জোয়ানরা তাদেরকে সেখানে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে প্রায় শতাধিক পাহাড়ী নারী-পুরুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিতে

বাধ্য হন। উল্লেখ্য যে, ক্ষতিগ্রস্তদের বেশীরভাগই ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী যারা চুক্তির পর পুনর্বাসন ও নিজ জমিজমা ফিরে পাবার আশায় দেশে ফিরে এসেছিলেন। আরো উল্লেখ্য, যে সকল বাঙালী জুম্মদের বাড়ীঘর রক্ষা ও আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিল তাদেরকেও হেনস্থা করা হয়। এমনকি শান্তি বাহিনীর দালাল নামে অভিহিত করে ধাওয়া করা হয়। এব্যাপারে স্থানীয় মাদ্রাসা শিক্ষক আব্দুল মালেক জানান যে, তিনি পাহাড়ীদের সাহায্য ও আগুন নেভানোর চেষ্টা চালালে তাকে 'শান্তি বাহিনীর দালাল' বলে ধাওয়া করা হয়। সেটেলারদের অগ্নি সংযোগ ও লুটপাট থেকে মাষ্টার পাড়ার আনন্দ বৌদ্ধ বিহার, চৌধুরী পাড়ার মংহ্লাপ্রু চৌধুরী স্মৃতি পাঠাগার ও বল্টুরাম টিলার ত্রিপুরা বেকার যুব কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ও রেহাই পায়নি। ত্রিপুরা বেকার যুব কল্যাণ সমিতির সভাপতি রতন বৈষ্ণব জানান যে, তাদের সমিতির পাশে বাঙালী দোকান থাকায় তাদের অফিসে আগুন না লাগিয়ে সেটেলাররা ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। এতে জাতীয় পতাকা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী ও স্বাধীনতা দিবসের পোষ্টার পুড়ে যায়।

এ হামলায় আধা পাকা বাড়ী ১৮টি, কাঁচা টিনসেড ৭১টি, ছনের ঘর ২১টি মোট ১১০টি বাড়ী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। লুটপাট ও ভাংচুর করা হয় ১১৭টি বাড়ী। ২০০০ জনের অধিক জুম্ম এ হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২ কোটি টাকার মতো। নিম্নে গ্রাম ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতি ঘরবাড়ীর বিবরণ দেয়া গেল-

ক্রঃ নং	গ্রাম	অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট	ভাংচুর ও লুটপাট	মোট
১	বল্টুরাম পাড়া	১০	৪	১৪
২	সুকেন্দ্রাই পাড়া	৯	৪	১৩
৩	জগন্নাথ পাড়া	-	৫৪	৫৪
৪	ঢেবার পাড়া	৪	১	৫
৫	চৌধুরী পাড়া	২৭	-	২৭
৬	মাষ্টার পাড়া	৬৬	৪৯	১১৫
৭	দক্ষিণ গর্জনতলী	১০	২	১২
৮	রামগড় বাজার	-	১	১
৯	বৈষ্ণব পাড়া	-	৩	৩
মোট		১২৬	১১৮	২৪৪

ঘটনার উদ্দেশ্য

এ ঘটনা মূল উদ্দেশ্য ছিল ভূমি বেদখল করা। জুম্মদের ভীতসন্ত্রস্ত করে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেয়া এবং এর ফাঁকে তাদের জায়গা-জমি দখল করে নেয়াই ছিল এ হামলার মূল কৌশল। ১৮ মে দীঘিনালায় জুম্মদের উপর হামলা এবং ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট, ২১ মে সেনা সদস্য কর্তৃক মাটিরাঙ্গায় জুম্ম নারী ধর্ষণ, ২৯ এপ্রিল মহালছড়িতে জুম্মদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনা উক্ত উদ্দেশ্যেরই ধারাবাহিক কার্যক্রম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ট্রাক ড্রাইভার আতর আলী হত্যাকান্ডের জের ধরে এ ঘটনার সূত্রপাত বলে বাহ্যতঃ মনে হলেও প্রকৃত ঘটনা তা নয়। কোন একটা অজুহাত সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে অনেক আগেই। এ উদ্দেশ্যে বাঙালী কৃষক-শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের ব্যানারে মিছিল-সমাবেশ আয়োজনের প্রস্তুতি চলছিল বেশ কয়েকদিন আগে থেকে। এ উপলক্ষে রামগড়ের বাইরে খাগড়াছড়ি সদর, মাটিরাঙ্গা, জালিয়াপাড়া প্রভৃতি স্থান থেকে ট্রাকভর্তি সেটেলার নিয়ে আসা হয়।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, কিছুদিন আগে বিডিআর ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিএনপি নেতা আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, আওয়ামী লীগ নেতা ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিগণ গোপন বৈঠক করে। এ বৈঠকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী তৎপরতা চালানোর জন্য নীলনক্সা প্রণীত হয় বলে জানা যায়। তাদের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮ মে দীঘিনালা ও ২৫ জুন রামগড়ে সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়। এছাড়াও থানা প্রশাসন সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বরং ৬ জন পাহাড়ীকে আতর আলী হত্যাকান্ডে মিথ্যাভাবে জড়িত করে গ্রেপ্তার করে। এছাড়াও ২৬ জুন ২৩৫নং নাকাপ্পা মৌজার হেডম্যান আপ্যচুই চৌধুরী থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানান।

৪ ঘন্টার বেশী সময় ধরে জুম্মদের বাড়ীঘরে হামলা-অগ্নিসংযোগ-লুটপাটের সময়ে পুলিশ-বিডিআর উভয় পক্ষই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে। এমনকি বিডিআর ক্যাম্পের পাশের বাড়ীতে হামলা-অগ্নিসংযোগ-লুটপাটের ঘটনা চলার সময়ও বিডিআর সদস্যরা হামলাকারীদের প্রতিহত করতে এগিয়ে যায়নি। এমনকি হামলার শিকার জুম্মরা প্রাণভয়ে তাদের ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে গেলে তাদের বাধা দেয়া হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে ঘটনাটি কোন দুর্গম এলাকায় নয়, ঘটেছে রামগড় থানা সদরের পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রে এবং ঘটনার সময় খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক আশরাফুল মকবুল, পুলিশ সুপার মোজাম্মেল হোসেন রামগড় থানা সদরে অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই জেলা

প্রশাসককে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০০০ইং জনৈক আবুল কালাম আজাদ ভূয়া বোমা দেখিয়ে তার অফিস কক্ষে দীর্ঘ সময় জিম্মি নাটক করেছিল। আর পুলিশ সুপারকে দু'মাস আগে কুষ্টিয়া থেকে খাগড়াছড়ি বদলী করা হয় কুষ্টিয়ার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার দায়ে।

ট্রাক ড্রাইভার আতর আলী হত্যাকান্ডের সাথে জুম্ম সন্ত্রাসীদের জড়িত থাকার অভিযোগও সত্য নয় বলে জানা যায়। কিছুদিন আগে জনৈক ট্রাকের মালিক তার ড্রাইভারকে বহিষ্কার করে আতর আলীকে নতুন ড্রাইভার হিসাবে নিয়োগ দেয়। এতে পূর্বতন ড্রাইভার ক্ষিপ্ত হয়ে তার প্রতিক্রিয়ায় আতর আলীকে খুন করেছে বলে স্থানীয় অনেকে অভিযোগ করেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির লক্ষ্যে আতর আলী হত্যাকান্ডের সাথে বাঙালী কৃষক-শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দরা জড়িত থাকতে পারে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। তাই নিজেদের অপরাধ ও অন্যায়কে ধামাচাপা দিয়ে প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার জন্য তারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করতে ১০ দফা দাবীনামার নাম ভাঙিয়ে এই সমাবেশটি আয়োজন করে বলে স্থানীয় জুম্মরা দাবী করেন।

প্রতিক্রিয়া

ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জনসংহতি সমিতি এই সাম্প্রদায়িক হামলাকে পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এযাবৎকালে জুম্মদের অধিকার ও অস্তিত্বকে নস্যাৎ করার জন্য যে সকল দাঙ্গা, গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে এটিও তার ব্যতিক্রম নয় বলে জানানো হয়েছে। জনসংহতি সমিতি মনে করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এই ভয়াবহ পরিস্থিতির অবসান ঘটানো সম্ভব হবে। জনসংহতি সমিতির এই অভিযোগের সাথে সুর মিলিয়ে স্বয়ং মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা বলেন, সোমবারের এই ঘটনাটি পূর্ব পরিকল্পিত। চুক্তি বিরোধীরা এই কাজ করেছে। প্রশাসনের কিছু অসৎ লোক এতে মদদ যুগিয়েছে।

জনসংহতি সমিতি ২৭ জুন তারিখে তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়। সমিতি উক্ত সাম্প্রদায়িক হামলার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবী জানায়। ১১ দলীয় বাম গণতান্ত্রিক জোটের এক বিবৃতি বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এসব সাম্প্রদায়িক তৎপরতা চালানো হচ্ছে। হামলার শিকার জুম্মরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে বাঙালী কৃষক-শ্রমিক কল্যাণ পরিষদ-এর নেতৃত্বদানকারী হেলাল ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের তদন্ত পূর্বক শাস্তির ব্যবস্থা করা, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি ২,০০,০০০/- টাকা ও ৩ বৎসরের রেশন সামগ্রী প্রদান করা, স্ব স্ব এলাকায় নিরাপত্তা প্রদান পূর্বক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা এবং ভবিষ্যতে এধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেই ব্যবস্থা করার দাবীনামা সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করে।

সরকারী পদক্ষেপ

২৭শে জুন ২০০১ইং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে যান। তাৎক্ষণিক এক সমাবেশে উভয়ে বক্তব্য রাখেন। তারা ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহবান জানান। এসময় খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, আঞ্চলিক পরিষদ সদস্যবৃন্দ, খাগড়াছড়ি জেলার ডিসি ও এসপি উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা বলেন, রামগড়ের দুঃখজনক ঘটনার জন্য কাউকে ক্ষমা করা হবে না। সভাস্থলে উপস্থিত পুলিশ সুপারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতে সোমবারের দুঃখজনক ঘটেছে। অতএব যে সমস্ত পুলিশ কর্মকর্তার অবহেলার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে তাদেরকে অবশ্যই কৈফিয়ত দিতে হবে। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের এই বলে আশস্ত করেন যে, যাদের অবহেলার জন্য এ ঘটনা ঘটেছে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি ধৈর্য্য ধরে পাহাড়ী-বাঙালী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আহবান জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

সমাবেশে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি বলেন যে, রামগড়ের জুম্মদের উপর বাঙালীদের হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে দীঘিনালা ও মাটিরাঙ্গায়ও এধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। পুলিশ ও সেনা সদস্যদের উপস্থিতিতে সংগঠিত রামগড়ের ঘটনাকে দুঃখজনক বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে একের পর এক এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনা ঘটে চলেছে। চুক্তিতে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে মূলতঃ সেনাশাসন এখনো চলছে। সর্বত্র সেনাবাহিনীর মদদে

চুক্তি বিরোধী উগ্র ইসলামপন্থীদের এ ধরনের আক্রমণ চলছে। অতএব প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের আগেই চুক্তির ব্যাপারে একটা বিহিত করতে হবে। মাতৃভূমিতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আহবান জানিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, শাসকগোষ্ঠী জুম্মদের অস্তিত্ব ধ্বংস করতে চায়। জুম্মদের এখানেই থাকতে হবে। এখানেই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের অস্তিত্বের লড়াই এখনো শেষ হয়নি। প্রয়োজনবোধে আবারও লড়াইয়ে নামতে হবে। তিনি বলেন, রামগড় ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারেরও দাবী জানান। পরিশেষে তিনি ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জুম্ম ও বাঙালীদের আহবান জানান।

মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা ২৭ তারিখের সমাবেশে ৭৫ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দের ঘোষণা দেন। তারপরদিন তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের লুঙ্গী, শার্ট ও শাড়ী বিতরণ করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদানের ঘোষণা করা হয়। তম্মধ্যে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ পরিবার প্রতি ১০ হাজার টাকা ও অন্যান্য পরিবারসমূহ পরিবার প্রতি ৫ হাজার টাকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বইপত্র কেনার জন্য প্রত্যেককে ৩ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়।

ঘটনার পরের দিন ২৬শে জুন বিডিআর-বিএসএফ এর ফ্ল্যাগ মিটিং এর মাধ্যমে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী জুম্মদের ফিরিয়ে আনা হয়। ২৮শে জুন ১৬ জন বাঙালীকে সন্ত্রাসের সাথে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয় ও মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তারকৃত ৬ জন পাহাড়ীকে মুক্তি প্রদান করা হয়। রামগড় থানার ওসি কাঞ্চন আলী মাহমুদকে ক্লোজ করা হয়।

---

১৬ পৃষ্ঠার পর

জুম্ম জনগণের সংগ্রাম, সংঘাত, সমঝোতা এবং জেএসএস বিরোধিতা

করতে ব্যতিব্যস্ত তাদের সঙ্গে? অথচ আন্দোলনের নামে কানাকড়িও এরা খরচ করেনি বরং পার্টির তথা আন্দোলনের সমস্ত প্রকার সুযোগটুকু তিলে তিলে ভোগ করেছে। প্রথম থেকে এরাই কিন্তু জনসংহতি সমিতি বিরোধী। কারণ পরিস্কার - জনসংহতি সমিতির বিরোধিতা না করলে সুযোগ কোথায়! উপরোক্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে যেগুলি আর্মী বা সরকারের দ্বারা সৃষ্ট নয় সেগুলির ক্ষেত্রে পার্টি বরাবরই উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে। এমনকি যাদের মধ্যে ১৯৮৩ সালের ষড়যন্ত্রের হোতা হিসেবে যারা খ্যাত সেই কুচক্রী নেতারাও কি আজ দিব্যি বেঁচে নেই! ওদেরও হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়া যেতো। কিন্তু তাতে কি লাভ হতো! সুতরাং কেবল পার্টি নয় আমরাও চাই জুম্ম জনগণের স্বার্থে যতটুকু সম্ভব কাজ করে যেতে। যতটুকু সম্ভব সবাই মিলে-মিশে কাজ করতে পারলে খুবই ভালো ছিল। নেহায়েত তা না হলেও মোটামুটি নিজেদের মধ্যে সখ্যতা বজায় রেখে কাজ-কর্ম হোক। আর তা না হলেও অন্তত নিজেদের মধ্যেকার সংঘাত এড়িয়ে আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত থাকুক। বৃহত্তর স্বার্থে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের সাথে আলাপ আলোচনা করে নিজেদের কর্মকান্ড চালাতে দোষের কি আছে। আপনি হতে পারেন প্রাক্তন বা বর্তমান ছাত্র নেতা, জননেতা, এমপি, মন্ত্রী, উপদেষ্টা, জনপ্রতিনিধি, বিত্তবান বিত্তহীন বা রাজা প্রজা। হতে পারেন জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের কারণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। হতে পারেন পার্টি বিরোধী বা সমর্থক। হতে পারেন চুক্তি বিরোধী। চুক্তি করে নাকি সার্কাস দেখাচ্ছে এমন সাক্ষাৎকারও শুনেছি বিবিসিতে। তা হোক। কিন্তু নিজে কি করেছেন সে প্রশ্ন কি করেছেন কখনও? নিজে কি করেছেন তা নিয়ে কি কখনো লজ্জাবোধ হয়নি? অনুতাপ নেই নিজেদের সীমাবদ্ধতার জন্য? আপনারা কতটুকু গণতান্ত্রিক হতে পেরেছেন তা কি আত্মজিজ্ঞাসা করেছেন? জনসংহতি সমিতির বিরোধিতা করে ব্যক্তির বা সামগ্রিকভাবে লাভ কি কিছু হয়? নিজের ক্ষোভ প্রকাশের জন্যই কি কেবল পার্টি বিরোধিতা? মূল কথা হলো পাটি বা পার্টি নেতৃত্বকে পছন্দ হয় না আপনাদের। তা হলে কি করা? নিজেও বিশেষ কিছু করতে পারছেন না আর জনসংহতি সমিতি যা করছে তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তাই পার্টি বা পার্টি নেতৃত্বকে যত্রতত্র গালিগালাজ করে তৃপ্তি পান। তাহলে নিজে কতটুকু গণতান্ত্রিক বা সহিষ্ণু তা একটু ভেবে দেখুন। জনসংহতি সমিতির বিরোধিতারও একটা সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষার ইতিবাচক ভূমিকা থাকতে পারতো পার্টি বিরোধীদের।

দীঘিনালায় জুম্মদের উপর বহিরাগত সেটেলারদের হামলা

গত ১৮ মে ২০০১ইং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালাস্থ বোয়ালখালী ও মেরুং এলাকায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বহিরাগত সেটেলার কর্তৃক পাহাড়ীদের উপর হামলা এবং তাদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ১৪ মে দীঘিনালায় ভিডিপি প্লাটুন কম্যান্ডার ওসমান গনি সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন। উক্ত ঘটনার সাথে পাহাড়ীদের জড়িত করে বহিরাগত সেটেলাররা দীঘিনালায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং ১৫ মে দীঘিনালায় এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। উক্ত মিছিলে সেটেলাররা 'রক্তের বদলে রক্ত চাই'সহ উত্তেজনাকর সাম্প্রদায়িক শ্লোগান ও বক্তব্য প্রদান করে। এরপর ১৭ মে সেনাবাহিনীর আহবানে সেটেলার নেতৃবৃন্দকে নিয়ে দীঘিনালা ক্যান্টনমেন্টে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮ মে সেটেলাররা আবারো বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করে। পাহাড়ী বিরোধী সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভ মিছিলটি দীঘিনালা উপজেলা মাঠ থেকে আরম্ভ হয়ে লারমা স্কোয়ার (বাসষ্টান্ড) পর্যন্ত চলে আসে। এরপর সেটেলাররা ট্রাক ও চাঁদের গাড়ী (খোলা জীপ) যোগে বোয়ালখালীর যথাক্রমে শান্তিপুর-লক্ষীপুর, কালাচান মহাজন পাড়া, হেমব্রত কার্বারী পাড়া (বিভূতি কার্বারী পাড়া) প্রভৃতি গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। সঙ্গে মেজর মোমিনের নেতৃত্বে দীঘিনালা ক্যান্টনমেন্টের একদল সেনা এবং দীঘিনালা থানার ওসি সগির আহমদ ও সেকেন্ড অফিসার মোজাম্মেলের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ও ভিডিপি সদস্যও ছিল।

মিছিলটি শান্তি-লক্ষীপুরে এসে পৌছলে জনৈক ভিডিপি সদস্য পুলিশের একটি রাইফেল নিয়ে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা আওয়াজ করে। এরপর সেটেলাররা গাড়ী থেকে নেমে পাহাড়ীদের উপর এলোপাতাড়ী হামলা, ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর ও লুটতরাজ আরম্ভ করে। হামলা চলাকালে পুলিশ ও সেনা সদস্যরা নীবর দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করে। এরপর একে একে কালাচান মহাজন পাড়া, হেমব্রত কার্বারী পাড়া (বিভূতি কার্বারী পাড়া) প্রভৃতি গ্রামে হামলা চালানো হয়। সেটেলাররা শিশু-মহিলা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে পাহাড়ীদেরকে লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে থাকে। অতর্কিত হামলায় পাহাড়ীরা প্রাণের তাগিদে যে যেদিকে পারে নিরাপদ স্থানে সরে যায়।

পরবর্তীতে শান্তি-লক্ষীপুরে পাহাড়ীরা সংঘবদ্ধ হয়ে সেটেলারদের হামলা প্রতিহত করতে এগিয়ে আসে। পাশাপাশি আক্রান্ত পাহাড়ীদের সহায়তার জন্য কবাখালী ও পাবলাখালী থেকে পাহাড়ী গ্রামবাসীরা এগিয়ে আসতে চাইলে সেনাবাহিনী মাঝপথে তাদের গতিরোধ করে এবং বেপোরোয়া লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে। পরিস্থিতির এমনি এক পর্যায়ে এবং সর্বোপরি পাহাড়ীদের তিনটি গ্রামে কমপক্ষে ৪২টি বাড়ী ভস্মিভূত ও ১৯১টি বাড়ী লুটপাটের পর সেনাসদস্যরা সেটেলারদেরকে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য যে, পাহাড়ীদের প্রতিরোধের কবলে একজন সেটেলারও গুরুতরভাবে আহত হয়।

সেটেলারদের উক্ত হামলায় শান্তি-লক্ষীপুরের মনিকা চাকমা পীং দেবেন্দ্র চাকমা (মাথায় ও ডানের উরুতে আঘাত) এবং শ্রীমতি পঞ্চালিকা চাকমা পীং সারাধন চাকমা (মাথায় ও বামের উরুতে আঘাত) গুরুতরভাবে আহত হন এবং শান্তি-লক্ষীপুরে পাহাড়ীদের ২৮টি বাড়ী ভস্মিভূত ও ১৪২টি বাড়ী লুটপাট, কালাচান মহাজন পাড়ায় ১৪টি বাড়ী ভস্মিভূত ও ১৯টি বাড়ী লুটপাট এবং হেমব্রত কার্বারী পাড়ায় (বিভূতি কার্বারী পাড়া) ৩০টি বাড়ীতে লুটপাট করা হয়।

অত্যন্ত হতাশার সাথে লক্ষ্য করা গেছে যে, পাহাড়ীদের উপর সেটেলারদের একতরফা হামলাকে ১৯ মে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে পাহাড়ী-বাঙ্গালী সংঘর্ষ হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচার করে থাকে এবং পাহাড়ীদের দ্বারা বাঙ্গালীদের বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বলে ভিত্তিহীন সংবাদ ছাপানো হয়ে থাকে।

উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৯ মে পাহাড়ীদের পক্ষ থেকে ঘটনায় উস্কানীদাতা ও জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানসহ সেটেলারদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার দাবী জানিয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কিন্তু আজ অবধি কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে উক্ত হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তার করা এবং তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা, উক্ত ঘটনার অনতিবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা, ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ীদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও আহতদের চিকিৎসা প্রদান করা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সেনাবাহিনী ও বহিরাগত সেটেলারদের সরিয়ে নেয়ার দাবী করা হয়েছে।

Durban, South Africa
September 6, 2001

PRESS RELEASE BY PCJSS & PEACE CAMPAIGN GROUP(DELHI)

RACISM & RACIAL DISCRIMINATION IN BANGLADESH

Racism and racial discrimination is a dangerous enemy to human human civilizations. It intends the destroy the fundamental principles governing the order of a democratic and multi-cultural society. It tries to eliminate the beauty and diversity of our mother-earth. It is a challenge to the collective endeavors of the international community to establish a world free from all forms of human rights violation.

Inter racial discrimination denies justice to other heterogenous racial groups. It is a serious crime. The indigenous Jumma peoples of Chittagong Hill Tracts and other parts of Bangladesh in general are subjected to racial discrimination on the following three basis reasons.

Firstly, perverted Bengali nationalism:

There are 45 distinct indigenous ethnic groups in Bangladesh and they constitute about 1.5% (about 2 million) of the country's total population. The constitution of Bangladesh is a racist constitution; it does not recognise the existence of any indigenous peoples in the country. Last year, in a statement, the ministry of External Affairs said that there was no relevance of observing the international decade of World's Indigenous Peoples(1995-2004) in Bangladesh, as there are no indigenous peoples in the country. This is legislative racial discrimination against the indigenous peoples.

Thw perverted bengali natinalissm enshrined in the constitution of Banglaedesh has engulf the indigenous peoples resulting in the deniel of the indigenous peoples' rights to self determination (political, economic and cultural autonomy) and land and natural resources. The recist policies os the government have been manifested in the forms of the militarisation, population transper and forcible occupation of land,economic miginalisation, domination, discrimination of education,employment, sporsts etc, religious conversion,,and son against the indigenous peoples.

In this context, it should be noted that the Government of Bangladesh has failed to respect its obligations to the Chittagong Hill Tracts Peace accord that was signed with the Parbattya Chattagram Jana Samhati Samiti(PCJSS) of the Chittagong Hill Tracts in 1997. As a result, the indigenous people continue to be subjected to state sponsored violations of human rights and to be deprived of their fandamental rights to land and property. Under development, poverty and lake of emloyment oppurtunitycoupled with political and social instability are gradually driving the indigenous people towards a humanitarian dister. the international community should take urgent and necesery measures for its remedy.

The education system of Bangladesh is mono-cultural. It does not incorporate the traditional knowledge systems of the indigenous peoples. Indigenous peoples have no access to education in their mother tongues.

Secondly, religious extremism:

Part 1, Article 2a of the Bangladesh constitution declares Islam as a state religion and says that other religions may be practiced in peace and hermony in the country. This step has, in fact, left no scope for development of the distinct religious belief systems of the indigenous peoples.

Thirdly, lack of democracy & education in human rights:

The legacy of colonial and military rules is still rampant in the governmental system in Bangladesh. Here there is no healthy democracy and good governance. The Bangladesh government has totally failed to put in practice the Article 79 of the Vienna Declaration and Program of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993.

Ironically, most of the common people and law-enforcing officials in bangladesh are unaware of the concept of human rights due to lack of government initiatives in this field. There is no national human rights commission in Bangladesh to deal with cases of human rights violation. Judicial inquiry commissions are set up occasionally to investigate particular cases of human rights violation against the indigenous peoples, but the commission influenced by racist policies of the government never come up with the facts lied in such cases. Three typical examples of such cases are: abduction of Ms. Kalpana Chakma, organising Secretary, Hill Women's Federation by a gang of Bangladesh millitary on 12 June 1996 and her subsequent disappearance, the deliberate killing of Saontal leader Mr. Alfred Saren of Nogaon on 18 August 2000 by some Bengalis allegedly aided by a few police officials and a Garo indigenous woman Ms. Gidita Rema of <agantinagar on 20 March 2001.

Constitutionally and institutionally Bangladesh is a state of one nation, one language and one religion. This structure of the state has appeared as a serious threat to the distinct identity of the indigenous peoples in Bangladesh.

The Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti(PCJSS)and the peace campaign group urge the WCAR to request the government of Bangladesh to bring necessary amendments in the constitution of Bangladesh with a view to constitutionally recognising the distinct identity of the indigenous peoples and their rights to self-determination and land and natural resources.

As a member state of the United Nations, the government of Bangladesh should respect the General Assembly Resolutions 1904(XVIII) of 20 November 1963 (United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) and 2106 A (XX) of 21 December 1965 (international convent on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) of the United Nations as well as the concerns expressed and recommendations made by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination with regard to the indigenous peoples in Bangladesh on 27 April 2001.

The WCAR needs to recommend all State to introduce a compulsory subject on human rights in the educational curriculum with a view to raising nation-wide as well as world-wide awareness about human rights. Let us impart human rights education to our today's children for a tomorrow's peaceful life.

সংবাদ প্রবাহ

সন্ত্রাসী অনিল তঞ্চঙ্গ্যার হাতে নির্মমভাবে খুন হলেন সনজিৎ তঞ্চঙ্গ্যা

১৬ জুলাই ২০০১ইং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অনিল তঞ্চঙ্গ্যার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে খুন হলেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের লড়াকু কর্মী সনজিৎ তঞ্চঙ্গ্যা। টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান পদ থেকে দীপংকর তালুকদার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে বীব বাহাদুরের পদত্যাগের দাবীতে সেদিন চলছিল তিন পার্বত্য জেলায় জনসংহতি সমিতি আহূত শান্তিপূর্ণ হরতাল। হরতাল চলাকালে হরতাল ভন্ডুল করার উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার বড়ইছড়িস্থ নোয়াপাড়ায় ওয়াগ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অনিল তঞ্চঙ্গ্যার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা চালায়।

সন্ত্রাসীরা চাঁদের গাড়ী যোগে গিয়ে প্রথমে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীদের উপর এলোপাতাড়ী গুলি বর্ষণ করে এবং সাথে সাথে গাড়ী থেকে নেমে ইট-পাটকেল, ধারালো কিরিচ ও লোহার রড দিয়ে তাদের উপর হামলা করে। সাথে সাথে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ওয়াগ্গা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি সনজিৎ তঞ্চঙ্গ্যা (২২) পীং ইন্দ্রলাল তঞ্চঙ্গ্যাসহ চারজন পিসিপি কর্মী আহত হন।

সন্ত্রাসীদের হামলা এখানেই থেমে থাকেনি। এরপর অনিল তঞ্চঙ্গ্যা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে গিয়ে ফোনে কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোনাস্থ কেপিএম থেকে ৪ ট্রাক সশস্ত্র সন্ত্রাসী এনে পুনঃ হামলার প্রস্তুতি নেয়। এসকল সন্ত্রাসীরা বড়ইছড়ি এলাকায় পৌঁছার সাথে সাথে অনিল তঞ্চঙ্গ্যার নেতৃত্বে জঙ্গী মিছিল বের করে। এক পর্যায়ে আহত পিসিপি'র কর্মীরা কাপ্তাই (বড়ইছড়ি) হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা দলবদ্ধভাবে তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং বেপোরোয়াভাবে লোহার রড, ধারালো কিরিচ ও ইট দিয়ে পুনরায় হামলা করে। চারজনের মধ্যে পিসিপি'র কর্মী আপাই মারমা কর্ণফুলী নদী সাঁতার কেটে পার হয়ে প্রাণে রক্ষা পান এবং আর অন্য দু'জন আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সনজিৎ তঞ্চঙ্গ্যাও কর্ণফুলী নদী সাঁতার কেটে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন কিন্তু অত্যধিক আহত হওয়ায় তিনি পুনরায় কূলে ফিরে আসতে বাধ্য হন। সে সময় তিনি কূলে উঠতে চাইলে সন্ত্রাসীরা তাকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে উপর্যুপরি ইট-পাটকেলের আঘাতে মাথায় গুরুতর জখম হলে তিনি ধীরে ধীরে কর্ণফুলী নদীতে তলিয়ে যান। তারপর দিন ১৭ জুলাই কর্ণফুলী নদীতে তার লাশ ভেসে ওঠে।

সেনা সদস্যদের লালসার শিকার হলেন আরো তিনজন জুম্ম নারী

২২ মে ২০০১ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার বারাচন্দ্র কার্বারী পাড়ার তিনজন ত্রিপুরা মহিলা সেনা সদস্যদের লালসার শিকার হলেন। সেদিন গভীর রাত ১.০০ ঘটিকায় গুইমারা ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণাধীন দুর্গাবাড়ী সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা সন্ত্রাসী তল্লাসীর নামে বারাচন্দ্র কার্বারী পাড়ায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় গ্রামবাসীদের ঘুম থেকে তুলে এক জায়গায় জড়ো করে। এক পর্যায়ে শ্রীমতি পূবালী ত্রিপুরা (২৩) স্বামী বাতারায় ত্রিপুরা, মিস কারান্দি ত্রিপুরা (২০) পীং হারা মোহন ত্রিপুরা ও মিস সনিতা ত্রিপুরাকে সেনা সদস্যরা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যায় এবং একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে তাদেরকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর সেনা সদস্যরা তাদেরকে আহত অবস্থায় ফেলে যায়। ধর্ষণকালে পূবালী ত্রিপুরার সঙ্গে থাকা এক বছরের শিশুও মারাত্মকভাবে আহত হয় বলে জানা যায়।

তারপর দিন তাদেরকে আহত অবস্থায় খাগড়াছড়ি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ধর্ষিতাদের অভিভাবকরা থানায় মামলা দিতে গেলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মামলা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। অপরদিকে পুলিশ কর্তৃপক্ষের আদেশ ব্যতীত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও ধর্ষিতাদের মেডিকেল পরীক্ষা করতে অপারগতা প্রকাশ করে। ফলে দীর্ঘ কয়েকদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থানা সত্ত্বেও ধর্ষিতাদের মেডিকেল পরীক্ষা করানো সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ধর্ষিতাদের অভিভাবকরা খাগড়াছড়ি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু আজ অবধি দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। অপরদিকে সেনা কর্তৃপক্ষ উক্ত ধর্ষণের ঘটনা তীব্রভাবে অস্বীকার করেছে। তবে বাংলাদেশের একটি নারী সংগঠন 'নারী পক্ষ' এ ঘটনার তদন্ত করে এবং তাদের তদন্তে উল্লেখিত জুম্ম মহিলারা সেনা সদস্যদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

এখনো সেনাবাহিনীর ধরপাকড় চলছে

গত ৯ মে ২০০১ইং বুধবার ভোর রাত ২.৩০ ঘটিকার সময় এসবেন আর্মী ক্যাম্পের প্রায় ১৩/১৪ জনের একটি সেনা

জওয়ান দল জীবতলী ইউনিয়নের ধুল্যাছড়িতে জীবতলী জনসংহতি সমিতি শাখার সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার চাকমার দোকান ও নিজ ঘর ঘেরাও করে। তখন সেনা দলের নেতৃত্বে যে ছিল সে জিজ্ঞেস করে - স্বপন কুমার ও তপন চাকমা কোথায়? তাদেরকে ক্যাম্পে হাজিরা প্রদান ও দেখা করার নির্দেশ দিয়ে জনসংহতি সমিতির অপর সদস্য দীপংকর তালুকদার ও সুনির্মল দেওয়ানকে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। অদ্যাবধি তাদের কোন খোঁজ মেলেনি।

জেএসএস সদস্যের সন্তান হওয়ার অপরাধে খুন হলেন ধনমুনি

জনসংহতি সমিতির সদস্য শ্রী চন্দ্র চাকমা ওরফে শ্রীমান-এর ছেলে ধনমুনি চাকমাকে (২২) চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসীরা গুলি করে নৃশংসভাবে খুন করে। ছেলেটি কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও জড়িত নেই। বিয়ে করে তিনি রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার কাউখালী বাজারস্থ শ্বশুরবাড়ীতে নিরিবিলি জীবন-যাপন করছিলেন। গত ৮/৬/২০০১ইং ভোর ৩টায় চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসীরা ধনমুনি চাকমার শ্বশুর বাড়ী ঘেরাও করে এবং দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে ঘুম থেকে ধনমুনিকে তুলে নিয়ে আসে। কিছুদূর নিয়ে যাওয়ার পর সন্ত্রাসীরা গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাকে। তার বাবা চন্দ্র চাকমা কাউখানী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। কিন্তু আজ অবধি পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। ধনমুনি চাকমার লাশ রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে ময়না তদন্ত করা হয়।

স্বাধীন মঙ্গল চাকমার বিজু উদযাপন হলো না

জনসংহতি সমিতির সদস্য শ্রী স্বাধীন মঙ্গল চাকমার আর বিজু পালন হল না। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জুম্মদের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় উৎসব 'বিজু' উদযাপনের জন্য অন্যান্য জুম্মদের মতো স্বাধীন মঙ্গল চাকমাও যখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন ইউপিডিএফ নামধারী চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সদস্যদের গুলিতে পানছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি গ্রামের নিজ বাড়ীতে নৃশংসভাবে খুন হলেন। স্বাধীন মঙ্গল চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির একজন সদস্য। তার অপরাধ তিনি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তার অপরাধ ছিল তিনি জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ সরকারকে বাধ্য করেছিলেন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরের মাধ্যমে জুম্মদেরকে আঞ্চলিক স্বায়ত্ব-শাসন প্রদানে।

১২/৪/২০০১ইং জুম্ম জনগণের ঐতিহ্যবাহী 'বিজু' উৎসবের ফুল বিজুর দিন। ঐতিহ্য অনুসারে এই দিনে খুব ভোরে শিশুরা পানিতে ডুব দিয়ে 'বিজুগুলা' খেতে নদীতে যায়, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্নান করে পবিত্র হয়, ঘাটে ফুল দেয়, ঘরবাড়ী ফুল দিয়ে সাজায়, শিশুরা ধান-চাল নিয়ে ঘরে ঘরে হাঁস-মুরগীদের খাদ্য দেয়, গ্রামে গ্রামে পড়ে সাজ সাজ রব। জনসংহতি সমিতির সদস্য স্বাধীন মঙ্গল চাকমাও এই জাতীয় আনন্দ উৎসবে শরীক হতে যথারীতি খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। তখন আকাশের পূর্ব দিগন্তে কিঞ্চিৎ আলোর রেখা ফুটে উঠেছিল। তখনও পুরোদমে সকাল হয়নি। ঘুম থেকে উঠার কিছুক্ষণ পর পাশের বাড়ী থেকে খবর আসে চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সদস্যরা প্রতিবেশী কয়েকটি বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। তাকে খুঁজছে। বার্তাবাহক প্রতিবেশী আত্মীয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে স্বাধীন মঙ্গলকে পরামর্শ দেয় পালিয়ে যেতে। পালিয়েও গিয়েছিল কিছুদূর। কিন্তু ফুল বিজু যে, ঘাটে যেতে হবে, 'বিজুগুলা' খেতে হবে, ফুলে ফুলে ঘর সাজাতে হবে, তাই তার অবুঝ শিশুকন্যা 'বাবা, বাবা' বলে ডাক দেয় তাকে। শিশু কন্যার আদুরে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেনি স্বাধীন মঙ্গল। আর তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই বিজু দিনে - যেদিন জুম্মরা অতীতের সকল হিংসা-বিবাদ ভুলে যায়, শত্রু-মিত্র একত্রে মিলেমিশে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে - অন্ততঃ বছরের এই দিনে মানুষের আদলে গড়া চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র হায়েনারা তাকে কিছুই করবে না। তাই ফেরার পথে তার আত্মীয়রা যখনি বলল - 'তুমি ফিরে আসছ কেন? পালিয়ে যাও'। তিনি বললেন - 'কিচ্ছু হবে না এই পবিত্র দিনে। আমি তো কোন অপরাধ করিনি। তাদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিনি'। এই বলে তিনি বাড়ীতে ঢুকে তার মেয়েকে কোলে নিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বন্দুক গর্জে ওঠে। এলোপাতাড়ী গুলি বর্ষণ শুরু করে। গুলির আওয়াজ শুনে কোলে নেয়া তার মেয়ে ভয়ে কেঁদে ওঠে। তখন হুড়মুড় করে বাড়ীতে ঢুকে সন্ত্রাসীরা স্বাধীন মঙ্গলের শিশু কন্যাকে তার কোল থেকে ফেলে দিয়ে তাকে লাঠি পেটা করতে করতে বাড়ী থেকে বের করে নিয়ে এল। সেসময় তার মেয়ে 'বাবা, বাবা' বলে আর্তনাদ করতে থাকে। বাড়ী থেকে ৫/৬ শ' গজ নিয়ে যাওয়ার পর প্রথমে ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ী আঘাত করে। তারপর উপর্যুপরি গুলি করে তার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়। সাথে সাথে একটি সংগ্রামী জীবনের অবসান হল হায়েনাদের জিঘাংসায়- যাদের অধিকার আদায়ের জন্য স্বাধীন মঙ্গল দীর্ঘ কয়েক বছর দুর্গম পাহাড়ের চড়াই-উৎড়াই পাড়ি দিয়েছিল, জীবন বাজী রেখে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছিল, জীবন-যৌবন সব কিছু ত্যাগ করেছিল। এই লোমহর্ষক হত্যাকান্ডের সাথে সাথে কেবল একজন স্বাধীন মঙ্গলের জীবনাবসান হল না, চুক্তি স্বাক্ষরের পর এনিয়ে ৩৩ জন স্বাধীন মঙ্গলের জীবন প্রদীপ চিরদীনের জন্য নিভে গেল।

সত্যবীর দেওয়ানের অশীতিপর মাতা-পিতাকে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ

প্রসিত-সঞ্চয়ের নেতৃত্বাধীন চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসীরা বর্তমানে কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের হত্যা, অপহরণ ও হামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও নিকট আত্মীয়দের উপরও নানা ধরনের হামলা ও অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১৯ মে ২০০১ চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জনসংহতি সমিতির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সত্যবীর দেওয়ানের অশীতিপর বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে রাত্রের মধ্যে তাদের নানিয়ারচরস্থ গ্রামের বাস্তুভিটা ছেড়ে রাঙ্গামাটিতে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে চরম পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। অনন্যোপায় হয়ে তারপরদিন ভোরে ঘরবাড়ী, বাগান-বাগিচা ও অন্যান্য সম্পত্তি ফেলে তারা তাদের কনিষ্ঠ ছেলে ডাঃ রূপম দেওয়ানের নিকট চলে আসতে বাধ্য হন। চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসীরা তাদের প্রায় ৭ একরের অধিক বাগান-বাগিচাও জব্দ করে ফেলে। ফলে গেল মৌসুমের হাজার হাজার টাকার কাঁঠাল, আম ইত্যাদি ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া বাগানের অনেক মুল্যবান গাছও এখন চুরি হয়ে যাচ্ছে।

কল্পনা চাকমার ৫ম অপহরণ দিবস পালন

১২ জুন ২০০১ইং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি ও বাঘাইছড়িতে কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদ সভা আয়োজন করা হয়। রাঙ্গামাটির শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মিস ওয়াইচিং প্রু মারমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভানেত্রী ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য শ্রীমতি মাধবীলতা চাকমা, আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য রওশন আরা বেগম, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতি উমে মং, জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী চন্দ্রশেখর চাকমা, জনসংহতি সমিতির উপদেষ্টা শ্রী মথুরালাল চাকমা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক শ্রী বিজয় কেতন চাকমা, আদি ও স্থায়ী বাঙ্গালী কল্যাণ পরিষদের নেতা জনাব মোখতার আহমেদ, বিশিষ্ট সমাজ সেবক শ্রী নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার সম্পাদক শ্রী সুদীর্ঘ চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে, সরকার কল্পনা অপহরণের বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করলেও অসদিচ্ছা ও অস্বচ্ছতার কারণে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শত শত মা বোন যেভাবে নির্যাতিত হয়েছে তার মধ্যে কল্পনা চাকমা অপহরণের মতো আরো অনেক অপহরণ, হত্যা, নির্যাতনের করুণ ইতিহাস অগোচরে রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও সরকারের একটি বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্র ও অসদিচ্ছার কারণে চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারছে না। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো নারী নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সমতলেও আদিবাসী নারীরা নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

প্রতিবাদ সভা শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপিতে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশ করা; এযাবৎ সংঘটিত জুম্ম নারী ধর্ষণ, হত্যা ও অপহরণ ঘটনার শ্বেতপত্র প্রকাশ ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা; রূপন, সুকেশ, মনতোষ ও সমর বিজয় চাকমার হত্যাকারীদের বিচার করা, তাদের পরিবারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা; অবিলম্বে সেনাশাসন এবং সেনাবাহিনী, আনসার, এপিবি ও ভিডিপির সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা; মে-জুন ২০০০ইং প্রণীত ভোটার তালিকা বাতিল করা এবং কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা; বহিরাগত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করার দাবীনামা উত্থাপন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ৫ বছর আগে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন গভীর রাতে বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন উগোলছড়ি গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে কল্পনা চাকমা লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগী সেনা ও ভিডিপি সদস্যদের দ্বারা অপহৃত হন। সেদিন সেনাবাহিনীর গুন্ডারা তার বড় ভাই ক্ষুদিরাম চাকমাকেও ধরে নিয়ে যায়। ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় নদীর ধারে এলে ক্ষুদিরামকে গুলি করার জন্য লেঃ ফেরদৌস নির্দেশ দেয়। মৃত্যু সন্নিকট দেখে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নদীতে ঝাঁপ দেন। সেনা ও ভিডিপি সদস্যরা তাকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি ব্রাশ ফায়ার করে। এলোপাতাড়ী গুলি বর্ষণের মুখে ভাগ্যক্রমে তিনি সেদিন পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। পালিয়ে আসার সময় তিনি 'দাদা আমাকে বাচাঁও, আমাকে বাচাঁও' বোনের করুণ আর্তনাদ শুনতে পান।

কল্পনা চাকমাকে অপহরণের পর পরই লেঃ ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে বাঘাইছড়ি থানায় মামলা দায়ের করতে চাইলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মামলা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অপহরণের প্রতিবাদে ও দ্রুত উদ্ধারের দাবীতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ যৌথভাবে ২৭ জুন ১৯৯৬ইং তিন পার্বত্য জেলায় অর্ধদিবস হরতালের ডাক দেয়। হরতাল কর্মসূচীকে ভন্ডুল করা ও অপহরণ ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী ঐদিন বাঘাইছড়িতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মদদ দেয়। ভিডিপি ও বহিরাগত সেটেলাররা বাঘাইছড়ির বাবুপাড়ায় হামলা চালিয়ে জুম্মদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, লুঠপাট ও ভাংচুর করে। এসময় কোন উস্কানী ছাড়াই জুম্ম ছাত্র-জনতার উপর ভিডিপি সদস্যরা এলোপাতাড়ী গুলি বর্ষণ করে। এতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মী রূপন চাকমা গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতরভাবে আহত হন এবং মুমুর্ষু রূপন চাকমাকে বহিরাগত সেলেটাররা কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাশাপাশি মুসলিম ব্লকের সেটেলাররা মনতোষ চাকমা, সুকেশ চাকমা ও সমর বিজয় চাকমাকে ধারালো কিরিচ ও বল্লমের খোঁচা মেরে মেরে মধ্যযুগীয় কায়দায় হত্যা ও গুম করে। সেনাবাহিনী কেবল এখানেই বসে থাকেনি। প্রকৃত অপহরণকারীদের আড়াল করার জন্য ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে কল্পনা চাকমার হদিসদাতাকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা সম্বলিত লিফলেট বিলি করে অপহরণের সাথে সেনাবাহিনী জড়িত নয় বলে ব্যর্থ অভিনয় করে।

জুম্ম ছাত্র-জনতার প্রবল প্রতিবাদের মুখে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহলের চাপে সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুল জলিলের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠনের মাধ্যমে অপহরণ ঘটনা তদন্তের জন্য নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়। উক্ত তদন্ত কমিশন কল্পনা চাকমার আত্মীয়-স্বজনসহ বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে সাক্ষ্যও গ্রহণ করেন এবং ক্ষুদিরাম চাকমা আলামতসহ লেঃ ফেরদৌস ও ভিডিপি সদস্য নুরুল হককে চিনতে পেরেছেন বলেও তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কিন্তু তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট আজ অবধি প্রকাশ করা হয়নি।

খিয়াং সম্মেলন

গত ৪ মে ২০০১ তারিখে জুম্ম জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে ক্ষুদ্র জাতি খিয়াং জাতির সম্মেলন রাঙামাটি জেলার রাজস্থলীস্থ খুল্যাপাড়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে খিয়াংদের সমস্যা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তারা মত প্রকাশ করেন যে, তারা তাদের ঐতিহ্যগত ভূমি থেকে ক্রমাগতভাবে বন বিভাগের বনায়ন কর্মসূচী দ্বারা উচ্ছেদ হতে চলেছেন। তারা ধনুছড়ি, জিংম্রং, পেকুয়া, কুক্যাছড়ি, চিয়াংকাং, কাপ্তাই প্রভৃতি এলাকায় প্রায় ৪ হাজার একর জমিতে স্মরণাতীতকাল হতে জুম চাষ করে আসছিল। সাম্প্রতিক সময়ে উক্ত সব এলাকা বন বিভাগ তাদেরকে কোন প্রকার অবহিত না করে বনায়নের জন্য দখল করে নিয়েছে। তারা বলেন যে, ৪ হাজার একরের মধ্যে বর্তমানে কেবলমাত্র ৭০ একর ভূমি তাদের বসবাসের জন্য অবশিষ্ট রয়েছে। অন্যদিকে কাপ্তাই থানাধীন চন্দ্রঘোনা এলাকায় কিছু খিয়াং থাকলেও তারা তাদের ভূমির মালিকানাসত্ত্ব আজ অবধি পায়নি। আ'লিক পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন যে, চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় জুম্ম জনগণ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করতে পারছেন না। তারা প্রতি পদে পদে কষ্ট ভোগ করছে। তার মধ্যে জুম্মদের একটি ক্ষুদ্র জাতি খিয়াংরাও তার ব্যতিক্রম নন।

বরকলক আতিয়ার ক্যাম্পের সুবেদারের হুমকি

গত ২৭/৪/২০০১ইং তারিখে বরকলক আতিয়ার ক্যাম্পের সুবেদার আহম্মদ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করেন যে অমল কৃষ্ণ চাকমা (২৪) পীং যত্তন্যা চাকমা, অনিল চাকমা (৩০) পীং বীর মোহন চাকমা ও প্রভাত চন্দ্র চাকমা (৫৫) পীং রাউচান চাকমা এর কাছে ৩টি এসএমজি রয়েছে। তাদের হয়রানি করার জন্য উক্ত সুবেদার বলেন যে, তার নিকট অস্ত্রগুলো জমা না দিলে তিনি তাদেরকে ধরে জেলে পুরবেন। বস্তুতঃ তাদের হাতে কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তারা কেন জনসংহতি সমিতির কাজ করে এটাই হলো তাদের অপরাধ। কেননা ইতিপুর্ব থেকে উক্ত সুবেদার জনসংহতি সমিতির কাজ না করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে আসছিল এবং ২৪/৪/২০০১ তারিখে বলেন যে, নির্বাচনে যদি কেউ জনসংহতি সমিতিকে ভোট দেয় তবে তিনি চরম ব্যবস্থা নিবেন।

সেনাবহিনী কর্তৃক সামাজিক বিচারে হস্তক্ষেপ

গত ২৩/৪/২০০১ইং বরকলক আতিয়ার ক্যাম্পের সুবেদার আহম্মদ হুমকি দিয়ে বলেন যে, গ্রামের যাবতীয় সামাজিক ও জমি সংক্রান্ত বিচার তিনি ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবে না। তার অনুমতি ছাড়া কেউ অন্যকে জমি দিতে পারবে না। সেনা কম্যান্ডারের যেই আদেশ সেই কাজ। এলাকার মিস মধুরানী চাকমার বিয়েতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেন।

মিস মধুরানী চাকমা পীং গদারাম চাকমা গ্রাম বরকলক, দুমদুম্যা ইউনিয়ন, বরকল উপজেলাকে সেনাবাহিনী গোয়েন্দা

কিরন্যা চাকমা পীং কাল্যাজিরা চাকমা গ্রাম বরকলক জোরপূর্বক বিয়ে করতে চায়। মেয়েটি যেহেতু তাকে বিয়ে করতে রাজী নয় এবং যেহেতু কিরন্যা চাকমার স্ত্রী রয়েছে তাই গ্রাম্য সালিশে এ বিয়ের বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু শহীদ আতিয়ার ক্যাম্পের কম্যান্ডার বলেন যে, তার অনুমতি ছাড়া কেউ জুম্মদের সামাজিক বিচার করতে পারবে না। তাই পরবর্তীতে তিনি জোর পূর্বক মধুরানী চাকমাকে কিরন্যা চাকমার সাথে বিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়। ফলে মেয়েটির অভিভাবকরা রাঙামাটিতে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু কম্যান্ডার সাহেব মেয়েটির অভিভাবকদের বাধ্য করে মামলাটি প্রত্যাহার করতে। অন্য কোন উপায় না দেখে মেয়েটি এখন পলাতক রয়েছে।

জাতিসংঘের বর্ণবাদ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিগত ৩১ আগস্ট হতে ৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে 'বিশ্ব বর্ণবাদ বিরোধী' একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও দিল্লি ভিত্তিক পীচ কেমপেইন গ্রুপ এর প্রতিনিধিগণও অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে 'Unrepresented Nations and Peoples Organisations' এর পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি পেশ করা হয়। বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়েও একটি রিপোর্ট স্থান পায়। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম 'Unrepresented Nations and Peoples Organisations' (UNPO) এর সদস্যভুক্ত।রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, 'UNPO' এর সদস্যভুক্ত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মজনগণও একইভাবে জাতিগত বর্ণবৈষম্যের শিকার; যেখানে আদিবাসীদের অস্তিত্বকে এখনো স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের সাথে আদিবাসী জুম্মদের সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সরকার সদিচ্ছা প্রদর্শন করছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রীয় মদদে পরিচালিত মানবাধিকার লংঘনের শিকার হচ্ছেন। এবং তারা তাদের ভূমি ও সম্পত্তির মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।'

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ থেকে
সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙামাটি
থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ১০ (দশ) টাকা মাত্র